Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসমিন আরা

রোলঃ 227020424

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসমিন আরা

রোলঃ 227020424

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারীর ভূমিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাসমিন আরা, আইডিঃ 227020424 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীর ভূমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তাসমিন আরা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তাসমিন আরা

আইডিঃ 227020424

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ইসলামে নারীর ভুমিকা

ইসলাম বিশ্বজনীন এক চিরন্তন ও শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে রয়েছে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও সকল অধিকারের স্বীকৃতি। ইসলাম নারীকে মানবসভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং মৌলিক অধিকার ও সামাজিক মর্যাদায় পুরুষের সমান অংশীদার মনে করে। মুসলিম নারীদের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়।

কুরআন সব মুসলিমকে জ্ঞানঅন্বেষণের প্রচেষ্টা করতে আদেশ দিয়েছে, তাদের লিঙ্গ যাই হোক না কেন। কুরআন ও হাদিস মুসলানদেরকে বারবার পড়তে, চিন্তা-ভাবনা করতে এবং প্রকৃতিতে আল্লাহপ্রদত্ত উপকরণ থেকে শিক্ষা নিতে বারবার তাগীদ দিয়েছে। এছাড়াও নারী-পুরুষ উভইকেই মুহাম্মদ (সাঃ) শিক্ষাঅর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, জ্ঞানঅন্বেষণ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। পুরুষের মত প্রত্যেক নারীই নীতিগত ও ধর্মিয় এমন বাধ্যবাধকতার অন্তর্ভূক্ত। যাতে তিনি জ্ঞানঅন্বেষণ করেন, নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধির চেষ্টা করেন, মননকে সমৃদ্ধ করেন, নিজের মেধা-প্রতিভার চর্চা করেন যাতে তার সুপ্ত সম্ভাবনার দ্বারা নিজে এবং তার সমাজ উপকার লাভ করতে পারে।

ইসলাম ও নারী

আল্লাহ তা'আলা যখন ফিরেশতাদের সামনে ঘোষণা করলেন-

إني جاعل في الأرض خليفة

পৃথিবীতে আমি খলীফাহ বানাতে চাই। (সূরা বাকারা (২) : ৩০)
তখন প্রকৃতপক্ষে সেটা শুধু একজন পুরুষ (বা হযরত আদম আ.)কে সৃষ্টি করার ঘোষণা ছিলো না, বরং নর ও নারী সম্মিলিতরূপে যে 'মানব' সেই মানব সৃষ্টির ঘোষণা ছিলো। অর্থাৎ সেটা হযরত আদম ও হযরত হাওয়া উভয়ের সৃষ্টির ঘোষণা ছিলো। কারণ পৃথিবীতে মানবজাতির বিস্তার ও খেলাফত শুধু পুরুষ দ্বারা সম্ভব ছিলো না। আদমের খেলাফতে হযরত হাওয়ার ভূমিকা ছিলো অনিবার্য ও অপরিহার্য। জান্নাতে আমাদের বাবা হযরত আদম (আ.)কে যখন সৃষ্টি করা হলো, তখন নিজের মধ্যে তিনি একটি শূন্যতা, একটি অভাব এবং অশান্তি অনুভব করছিলেন। তিনি যখন ঘুমুলেন তখন তাঁর বামপার্শ্বের অস্থির ঊর্ধ্ব-অংশ থেকে প্রথম নারী হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করা হলো। কেন? আদম যেন তাঁর সঙ্গ দ্বারা সুখ-

শান্তি এবং স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করেন। বস্ত্তত পৃথিবীর প্রথম নারী ছিলেন প্রথম পুরুষের জন্য স্রষ্টার পক্ষ হতে জান্নাতের চেয়েও মূল্যবান উপহার। কারণ জান্নাত তার অফুরন্ত নায-নেয়ামত সত্ত্বেও আদমের অন্তরের শূন্যতা, নিঃসঙ্গতা, অভাব ও অশান্তি দূর করতে পারেনি। একা একা জান্নাত ভোগ করে আদমের অন্তরে শান্তি আসেনি। হযরত হাওয়াকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাওয়ার পরই আদমের কাছে জান্নাত জান্নাত মনে হয়েছিলো। জান্নাতের বাগানে দু'জনের এই যে শান্তির সম্পর্ক, এটা শুধু ঐ দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উভয়ের সন্তানসন্ততির ক্ষেত্রেও সমান সত্য। তাই আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

هو الذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن إليها

তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি 'নফস' থেকে এবং বানিয়েছেন তার থেকে তার জোড়া যেন সে তার কাছে স্বস্তি লাভ করে। (সূরা আরাফ : ১৮৯)

সুতরাং বোঝা গেলো, পৃথিবীর প্রতিটি স্ত্রী তার স্বামীর জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পবিত্র উপহার। এজন্যই আল্লাহর নামকে মাধ্যম করে এবং মোহর আদায় করে একটি জান্নাতি উপহাররূপেই নারীকে গ্রহণ করতে হয়। আর এজন্যই বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক মুহূর্তে আল্লাহর পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

و إنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله

আর তোমরা তাদের গ্রহণ করেছো আল্লাহর আমানতরূপে, আর তোমরা তাদের 'লজ্জাস্থান'কে হালাল করেছো আল্লাহর কালিমাকে মাধ্যম করে।' (সহীহ বুখারী ১/৩৯৭)

তো উপরের আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো-

(ক) ফিরেশতাদের সভায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে খেলাফতের যে ঘোষণা, প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো নর ও নারীর সম্মিলিত যে 'মানবরূপ' সেই মানবসৃষ্টির ঘোষণা। (তাতে হযরত আদম আ.-এর ভূমিকা অবশ্যই প্রধান, তবে হযরত হওয়া আ.-এর ভূমিকাও ছিলো অনিবার্য ও অপরিহার্য।)

(খ) নারী হচ্ছে নরের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পবিত্র উপহার। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ শান্তি ও স্বস্তি লাভ করা।

(গ) পুরুষের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা দান করা এবং নারীর জীবনে সুখ-শান্তি নিশ্চিত করা। কারণ কোন নারী যদি তার পরিবারে লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত হয়; তার জীবনে যদি অশান্তি থাকে তাহলে সে পুরুষের জন্য সুখ-শান্তি ও স্বস্তির মাধ্যম কিছুতেই হতে পারবে না।

হযরত আদম আ. যত দিন জান্নাতে ছিলেন, তারপর যতদিন দুনিয়াতে জীবনযাপন করেছেন মা হাওয়াকে তিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনীরূপে প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা পরিপূর্ণরূপে দান করেছেন এবং সর্বদিক থেকে তাঁর সুখ-শান্তি নিশ্চিত করেছেন। ফলে তিনি নিজেও মা হাওয়ার সঙ্গে থেকে সুখ-শান্তি লাভ করেছেন।

হযরত আদম (আ.)-এর ইনতিকালের পর মানবজাতি যত দিন তাদের পিতার তরীকার উপর ছিলো এবং নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা দান করেছিলো তত দিন তারা সুখে শান্তিতেই জীবন যাপন করেছে। নারীর কাছে সে সুকূন ও স্বস্তি পেয়েছে।

কিন্তু একটা সময় এলো যখন মানুষ আল্লাহর বিধান ও শরীআত ভুলে গেলো এবং শয়তানের প্ররোচনায় হিদায়াত ও সত্যপথ হতে ভ্রষ্ট হলো তখন অন্যান্য অনাচারের সঙ্গে নারীজাতির উপরও নেমে এলো বিভিন্ন অনাচার-অবিচার। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সভ্যতায় নারীজাতিকে কী কী দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে এখানে আমরা সংক্ষেপে তা তুলে ধরছি।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী

গ্রীক ও রোমান সমাজে নারীকে মনে করা হতো সকল অনিষ্টের মূল এবং সবচে' নিকৃষ্ট প্রাণী। পরিবারে মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যা কোন নারীর মর্যাদাই দাসীর চেয়ে বেশী ছিলো না। নারী ছিলো বাজারে বেচা-কেনার পণ্য। পরিবার-প্রধান যে কোন নারীকে বাজারে বিক্রি করতে পারতো। কারণ আইনগতভাবেই নারী ছিলো পরিবারের অস্থাবর সম্পত্তি।

কোন পর্যায়েই নারীর উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিলো না। পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী তার সম্পত্তি ভোগ করতে পারতো না এবং হস্তান্তরও করতে পারতো না।

বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর নিজস্ব কোন ইচ্ছা বা অধিকার ছিলো না। পরিবারের প্রধান পুরুষ যে স্বামী নির্বাচন করতো তাকেই গ্রহণ করতে নারী বাধ্য ছিলো।

প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি প্রতিক্রিয়া থাকে, এটাই প্রকৃতির অমোঘ বিধান। সে হিসাবে গ্রীক ও রোমান উভয় সভ্যতারই শেষ দিকে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। নারীসমাজ বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত উশৃঙ্খল হয়ে উঠলো এবং সমাজের সর্বত্র নগ্নতা ও যৌননৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়লো, যার অনিবার্য ফলরূপে গ্রীক ও রোমান সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে গেলো।

তুরস্কের সুপ্রসিদ্ধ নারী বুদ্ধিজীবী খালিদা এদিব খানম গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় নারীর লাঞ্ছনা সম্পর্কে 'তুরস্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব' নামক গ্রন্থে অত্যন্ত বিশদ আলোচনা করেছেন।

ইহুদিজাতি ও খৃস্টধর্মে

নারীকে অভিশপ্ত মনে করা হয়, কারণ তাদের ধারণায় আদমকে ভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান হাওয়াকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলো। উভয়জাতির বিশ্বাস ছিলো যে, স্ত্রীলোক স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না, কারণ তার মধ্যে মানবাত্মা নেই। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ৫৮৬ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সে এক ধর্মসম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো যে, স্ত্রীলোককে মানুষ বলা তো যায়, তবে তাকে শুধু পুরুষের সেবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

খৃস্টধর্মের প্রভাবে নারীর প্রতি পাশ্চাত্যজগতের আচরণ ছিলো চরম অবমাননামূলক, যা মধ্যযুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এমনকি ১৮০৫ সাল পর্যন্ত বৃটিশ আইনে স্বামীর অধিকার ছিলো স্ত্রীকে বিক্রি করার। অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লবের পরও নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করার কথা সেখানকার চিন্তানায়কদের মাথায় আসেনি। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ফরাসী নাগরিক আইনে

অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নারীর অধিকার ছিলো না কোন বিষয়ে কোন পক্ষের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার।

হিন্দুসমাজে নারীর অবস্থা ছিলো সবচে' করুণ। এ প্রসঙ্গে শুধু সতীদাহ-এর কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট, যা এই মাত্র সেদিন সংস্কারবাদী নেতা রাজা রামমোহন রায় ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমে বাতিল করিয়েছেন।

আরব জাহিলিয়াতের সমাজেও আছে নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার মর্মন্তুদ ইতিহাস। শুধু এইটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, কন্যাসন্তানের জন্মকে তখন মনে করা হতো চরম কলঙ্কের বিষয়। জাহেলি সমাজের এই চিত্রটি দেখুন আলকোরআনে-

وإذا بشر إحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا و هو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به, أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ,ألا ساء ما يحكمون

(আর যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তান জন্মের সংবাদ দেয়া হতো তখন দুশ্চিন্তায় তার মুখ কালো হয়ে যেতো, আর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। ঐ জঘন্য খবরের কারণে মানুষের কাছ থেকে সে মুখ লুকিয়ে ফিরতো। (আর দিশেহারা হয়ে ভাবতো যে কী করবে সে?) লাঞ্ছনা সহ্য করে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে। কত মন্দ ছিলো তাদের এ মনোভাব! (সূরা নাহল : ৫৮)

সেখানে নারীর জন্মগ্রহণই ছিলো অপরাধ, আর বেঁচে থাকা ছিলো আরো বড় অপরাধ। তাই অধিকাংশ সময় জন্মদাতা পিতা কন্যাসন্তানকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতো এবং নিজের হাতে জ্যান্ত দাফন করে ফেলতো। অসহায় মায়ের বাধা দেয়ার কোন অধিকার ছিলো না। তাই কন্যাসন্তান জন্ম দেয়ার আশঙ্কায় মা ভুলে যেতো তার প্রসববেদনা। অস্থির পেরেশান হয়ে শুধু ভাবতো পিতার নিষ্ঠুরতা থেকে কীভাবে সে বাঁচাবে তার সন্তানকে? কোথায় কীভাবে লুকাবে সে তার কলিজার টুকরোকে? কোরআনে অত্যন্ত আবেদনপূর্ণ ভাষায় এই নিষ্ঠুর প্রথার নিন্দা করে বলা হয়েছে-

وإذا الموؤودة سئلت0 بأي ذنب قتلت0

আর যখন জ্যান্ত দাফনকৃত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো (তখন কী জবাব দেবে তোমরা?) (সূরা আত-তাকভীর : ৮ ও ৯)

তো এই ছিলো ইসলামের পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থা ও মর্যাদাগত অবস্থান। এককথায় যদি বলি তাহলে বলতে হয়, মানুষ হিসাবে নারীর কোন মর্যাদাই ছিলো না। চরম লাঞ্ছনা ও যিল্লতি ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই ছিলো না।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

প্রথম কথা এই যে, মৌলিক মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে এবং দ্বীন ও ধর্মের যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে পুরুষের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

বিকৃত ইহুদিধর্ম ও খৃস্টধর্ম যেখানে আদমের বিচ্যুতির জন্য হাওয়াকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে ইসলাম সেখানে আদম ও হাওয়া দুজনকে ভুল ও ক্ষমা প্রার্থনা উভয়ক্ষেত্রে অভিন্ন সাব্যস্ত করেছে। ইরাশাদ হয়েছে-

فأزلهما الشيطن عنها

শয়তান উভয়কে তা থেকে বিচ্যুত করেছে। (সূরা বাকারা : ৩৬)

ভুল শোধরানো সম্পর্কে বলা হয়েছে-

قالا ربنا ظلمنا أنفسنا

তারা উভয়ে বললো, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। (সূরা আরাফ : ২৩)

তবে যেহেতু পরিচালক হিসাবে আদমের দায়িত্ব ছিলো বেশী সেহেতু এককভাবে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে-

فنسى ولم نجد له عزما

সে ভুলে গিয়েছিল। আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি। (সূরা ত্বহা : ১১৫)

নারী ও পুরুষের মৌলিকভাবে সমান অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে কোরআনে বলা হয়েছে-

هن لباس لكم و أنتم لباس لهن

এবং নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। তবে তাদের উপর পুরুষদের এক পর্যায়ের প্রাধান্য রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা : ২২৮)

এই এক পর্যায়ের প্রাধান্য হল, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধানের মর্যাদা, যা সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর এটি স্বামী-স্ত্রীর জীবন চলার পথে একটি অপরিহার্য বিষয়।

হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

إنما النساء شقائق الرجال

অর্থাৎ নারীরা হলো পুরুষের সমতুল্য। (সুনানে আবু দাউদ ১/৩১)

আরো ইরশাদ হয়েছে-

من كانت له أنثى فلم يئدها و لم يهنها و لم يؤثر ولده الذكور عليها أدخلها الله الجنة

যে ব্যক্তি কন্যসন্তানকে জ্যান্ত দাফন করবে না এবং তার অমর্যাদা করবে না এবং পুত্রসন্তানকে তার উপর অগ্রাধিকার দেবে না আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখেল করবেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৫১০৩)

দ্বীন ও ধর্মের যাবতীয় কর্মে নারী ও পুরুষের সমমর্যাদা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

و من عمل صلحا من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فأؤلئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب

আর যে কোন পুরুষ বা নারী নেক আমল করবে, আর সে মুমিন হবে, তাহলে তারা জান্নাতে দাখেল হবে এবং সেখানে তাদেরকে বেলা হিসাব রিযিক দান করা হবে। (সূরা মুমিন : ৪০)

আরো ইরশাদ হয়েছে-

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عمل منكم من ذكر أو أنثى ,بعضكم من بعض

অনন্তর তাদের প্রতিপালক তাদের দু'আ কবুল করলেন (আর বললেন) যে, আমি তোমাদের কোন আমলকারীর আমল নষ্ট করবো না, সে পুরুষ হোক, বা নারী। তোমরা তো পরস্পরের অংশবিশেষ। (সূরা আলইমরান : ১৯৫)

নারীর সঙ্গে পুরুষের যতগুলো সম্পর্ক হতে পারে প্রতিটি সম্পর্ককে ইসলাম অনন্য মর্যাদা ও মহিমায় অধিষ্ঠিত করেছে। এক্ষেত্রে নারীকে শুধু সমমর্যাদা নয়, বরং অগ্রমর্যাদা দান করেছে। প্রথম সম্পর্ক হলো মা হিসাবে। তো ইসলাম ও তার নবীর কাছে মায়ের যে মর্যাদা তা পৃথিবীর কোন ধর্ম ও সভ্যতা এমনকি আধুনিক সভ্যতাও কল্পনা করতে পারেনি। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها

'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারের আদেশ করেছি। (কারণ) তার মা তাকে কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সঙ্গে প্রসব করেছে।' (সূরা আহকাফ : ১৫)

এখানে পিতা-মাতা উভয়ের সঙ্গে সদাচার কেন করতে হবে তার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে পিতার কোন অবদানের কথা বলা হয়নি, শুধু মায়ের ত্যাগ ও কষ্টের কথা বলা হয়েছে। অথচ পিতারও বিরাট অবদান রয়েছে সন্তানের জীবনে। এটা এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, মাতার ত্যাগ ও কষ্টের তুলনায় পিতার ত্যাগ ও কষ্ট খুবই সামান্য।

হাদীছ শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সদাচারের বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর পর তোমার বাবা। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৯৭১)

আফসোস, যে ধর্মের নবী তাঁর উম্মতকে মাতৃজাতি সম্পর্কে এমন উপদেশ দান করেছেন সে ধর্মকে আজ নারী অধিকারের বিরোধীরূপে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। পক্ষান্তরে যেসকল ধর্ম ও সভ্যতার হাতে এবং যে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার হাতে নারীজাতি বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়েছে তারা পেয়ে যাচ্ছে বেকসুর খালাস, বরং উলটো সেজে বসেছে নারীদরদী!

ফিরে আসি হাদীছের আলোচনায়। শুধু এই হাদীছই নয়, বরং অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, এক ছাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে গমন করতে চাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি মা আছেন? ছাহাবী বললেন, আছেন। তখন তিনি বললেন, যাও তার কাছে বসে থাকো, কেননা জান্নাত তার পায়েরই কাছে। (মুসনাদে আহমদ ৩/৪২৯; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ১৩/৮০)

অন্য বর্ণনায় আছে, 'জান্নাত হলো মায়েদের কদমের নীচে।' (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ৭৩৩০)

দ্বিতীয় সম্পর্ক হলো স্ত্রী হিসাবে। তো এ সম্পর্কে দেখুন, কোরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-

و عاشروهن بالمعروف ,فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيأ و يجعل الله فيه خيرا كثيرا

আর তোমরা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বসবাস করো সদাচারের সাথে। আর যদি (কোন কারণে) তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো তাহলে হতে পারে যে, তোমরা এমন কোন কিছুকে অপছন্দ করলে, আর আল্লাহ তাতে প্রচুর কল্যাণ রেখে দিলেন। (সূরা নিসা : ১৯)

এ বিষয়টি হাদীছ শরীফে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন, 'কোন মুমিন পুরুষ কোন মুমিন নারীকে যেন সম্পূর্ণ অপছন্দ না করে। কারণ তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে, আরেকটি স্বভাব অবশ্যই পছন্দনীয় হবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৬৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৯৭৯)

এখানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষের দাম্পত্যজীবনের এমন একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যার উপর আমল করলে এখনই আমাদের সংসার 'জান্নাত-নযীর' হয়ে যেতে পারে।

দু'জন নারী-পুরুষ যখন একত্রে ঘর-সংসার করবে তখন একজনের সবকিছু অপরজনের ভালো লাগবে এটা হতেই পারে না। কিছু আচরণ ভালো লাগবে, কিছু মন্দ লাগবে, এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে পুরুষের করণীয় হলো, স্ত্রীর ভালো গুণগুলোর দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহর শোকর আদায় করা যে, আলহামদু লিল্লাহ আমার স্ত্রীর মধ্যে এই এই ভালো গুণ তো আছে! আল্লাহর শোকর আদায় করবে, আবার আন্তরিকভাবে স্ত্রীর প্রশংসা করবে। তখন হয়ত আল্লাহ তার মন্দ স্বভাবগুলো দূর করে দেবেন।

সুতরাং পুরুষের কর্তব্য হলো স্ত্রীর ত্রুটিগুলোর প্রতি ক্ষমাসুন্দর হওয়া, আর ভালো গুণগুলোর কদর করা। কারণ পূর্ণতা তো কোন মানুষেরই নেই। না নারীর, না পুরুষের।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

و عاشروهن بالمعروف ,فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيأ و يجعل الله فيه خيرا كثيرا

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই যে তার স্ত্রীদের জন্য তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের জন্য সর্বোত্তম। (সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ. ১৪২; জামে তিরমিযী, হাদীস : ১১৬২)

উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ কেমন ছিলো তার বিশদ বিবরণ সীরাতের কিতাবে রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য তা পড়া এবং নিজেদের জীবনে তা আমলে আনা, যাতে প্রতিটি সংসার হতে পারে শান্তির জান্নাত। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনে কোন নারীকে প্রহার করেননি, বরং যখনই ঘরে প্রবেশ করতেন (তাঁর মনের অবস্থা যেমনই হোক) পবিত্র মুখমন্ডল হাসিতে উদ্ভাসিত থাকতো। তিনি নিজের কাজ নিজে করা পছন্দ করতেন, এমনকি

ছেঁড়া জুতা নিজের হাতে সেলাই করতেন। (শামাইলে তিরমিযী; আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ)

বর্ণিত আছে, তিনি যখন রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, ঘরের দরজা খুব আস্তে খুলতেন যাতে ঘরের লোকদের ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে। আরো বর্ণিত আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুছল্লায় দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন তখন ঘুমের অবস্থায় মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পা মুছল্লার উপর চলে আসতো। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় যাওয়ার সময় কোমলভাবে মা আয়েশা (রা.)-এর পা সরিয়ে তবে সিজদায় যেতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৫১২)

এজন্য কখনো বিরক্তি বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন না। সুবহানাল্লাহ!

একটি হাদীছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

استوصوا بالنساء خيرا

আমি তোমাদেরকে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে উত্তম আচরণের উপদেশ দিচ্ছি; তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ করো। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ১১৬৩)

কন্যা ও ভগ্নি হিসাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ শুনুন, যার খোলাছা হলো, কারো ঘরে যদি তিনজন বা দুজন কন্যা বা ভগ্নি থাকে, আর সে তাদের উত্তম শিক্ষাদীক্ষা দান করে, তারপর তাদেরকে উত্তম পাত্রে বিবাহ দেয় তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম) কোন কোন বর্ণনায় আছে, তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। কোন বর্ণনায় আছে, তাহলে সে আর আমি জান্নাতে এরূপ পাশাপাশি থাকবো। তারপর তিনি দুই আঙ্গুল পাশাপাশি রেখে ইশারা করলেন।

এক হাদীছে আছে-

لا تكرهوا البنات ,فإنهن المؤنسات الغاليات

তোমরা মেয়েদের অপছন্দ করো না। কারণ তারা অন্তরঙ্গতা পোষণকারী মূল্যবান সম্পদ। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৭৩০৬)

যে কোন পরিবারে আপনি পিতা-মাতার প্রতি কন্যাসন্তানের অনুভব-অনুভূতি এবং সেই তুলনায় পুত্রসন্তানের অনুভব-অনুভূতি পর্যবেক্ষণ করে দেখুন, অবশ্যই আপনার বুঝে আসবে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন কন্যসন্তানদের সম্পর্কে একথা বলেছেন!

নারীদের প্রতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুভূতি

নারীসমাজের প্রতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুভূতি কেমন ছিলো এবং তাদের কষ্ট ও সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তিনি কত সজাগ ছিলেন এবং তাদের বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি তাঁর কিরূপ আস্থা ছিলো তা নীচের বর্ণনাগুলো থেকে পরিষ্কাররূপে বোঝা যাবে। তিনি ইরশাদ করেছেন-

حبب إلي من دنياكم الطيب و النساء و جعلت قرة عيني في الصلوة

তোমাদের দুনিয়াতে সুগন্ধি ও নারীকে আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে, আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে ছালাতের মধ্যে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১২২৩৩)

এই হাদীছটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। কারণ সুগন্ধি ও নারীর একত্র উল্লেখ দ্বারা বোঝা যায় যে, স্বভাব ও ফিতরত এবং সৃষ্টিগত দিক থেকে নারী সুগন্ধির মতই সিণগ্ধ ও পবিত্র। সুগন্ধি যেমন হৃদয়ে মস্তিষ্কে কোমল ও সিণগ্ধ অনুভূতি সৃষ্টি করে, নারীর সংস্পর্শও তেমনি কোমলতা, সিণগ্ধতা ও পবিত্রতার অনুভূতি সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত এখানে পছন্দ করার কথা বলা হয়নি, বরং পছন্দ করানোর কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ নবীর অন্তরে নারীর এই প্রিয়তা ও পছন্দনীয়তা নিছক মানবিক কোন আকর্ষণ নয়, বরং এটি সম্পূর্ণ ঐশী বিষয়। আল্লাহ তা'আলার গায়বি ইশারা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ এটি যত না জৈবিক তার চেয়ে অনেক বেশী আত্মিক ও আধ্যাত্মিক। বলাবাহুল্য, এতে স্ত্রীজাতির আধ্যাত্মিক মর্যাদাও প্রকাশ পায়। অথচ ইসলামের পূর্বে নারীকে অপবিত্র সত্তা বলে সাব্যস্ত করেছে।

স্ত্রীজাতির সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তিনি কতটা সজাগ ছিলেন তা নীচের এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়। ঘটনার খোলাছা এই যে, একবার নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে নামায পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় পিছন থেকে কোন শিশুর কান্নার আওয়ায পেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি নামায সংক্ষিপ্ত করে সালাম ফেরালেন, আর বললেন, আমি নামায সংক্ষিপ্ত করেছি, যাতে ঐ মা তার সন্তানের কারণে পেরেশান না হয়। (সহীহ বুখারী, সালাত অধ্যায়)

একসফরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, আনজাশা নামে এক ছাহাবী উট দ্রুত হাঁকিয়ে নিচ্ছেন। ঐ উটের আরোহী ছিলো নারী। তখন তিনি ছাহাবীকে ধীরগতিতে ও কোমলভাবে উটচালনা করার আদেশ দিয়ে বললেন-

رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير

ধীরে হে আনজাশা! কাচের পাত্রগুলোর প্রতি কোমল হও। (বুখারী ও মুসলিম)

নারীকে কাচের পাত্রের সঙ্গে উপমা প্রদান করা কত যে প্রজ্ঞাপূর্ণ তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই একটি উপমা দ্বারাই উম্মতকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নারীর স্বভাব ও প্রকৃতি কত কোমল এবং তাদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে পুরুষকে কত সতর্ক, সাবধানী ও কোমল হতে হবে।

(এটা অবশ্য আলাদা বিষয় যে, মুসলিম নারীদের প্রতি মুসলিম পুরুষদের বর্তমান আচরণ কিরূপ? বর্তমানে কতজন মুসলমান এমন আছেন, যারা নবীর এই মহামূল্যবান উপদেশের প্রতি যত্নবান? ঘরে ও সফরে নারিদের সুখ-সুবিধার প্রতি তারা কী পরিমাণ খেয়াল রাখে? কী পরিমাণ কোমল আচরণ করে? আর কাল কেয়ামতের দিন তাদের নবীর কাছে তারা কী জবাব দেবে?)

ইলমের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার

ইসলামের পূর্বে অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতা যেখানে নারীর শিক্ষার কোন অধিকারই স্বীকার করেনি। এমনকি আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায়ও এই সেদিন পর্যন্ত যেখানে নারীশিক্ষাকে ঘৃণার চোখে

দেখা হতো সেখানে ইসলাম সেই প্রথম দিন থেকে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষার সমান অধিকার ঘোষণা করেছে।

কারণ এটা তো বলাই বাহুল্য যে, দ্বীন ও শরীয়াতের উপর আমল করা পুরুষের জন্য যেমন ফরয তেমনি নারীর জন্যও ফরয। আর শরীয়তের ইলম অর্জন না করে শরীয়তের উপর আমল করা সম্ভব নয়। আর কোরআনের

رب زدنى علما

হে আল্লাহ আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো। (সূরা ত্বহা : ১১৪)

এই প্রার্থনা তো পুরুষ ও নারী উভয়েই আল্লাহর কাছে করে থাকে। আর এটা শুধু জ্ঞান অর্জনের দু'আ নয়, বরং অধিক থেকে অধিক জ্ঞান অর্জনের দু'আ।

طلب العلم فريضة على كل مسلم ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ২২৪; তবরানী-আওসাত, হাদীস : ৯) এ হাদীছ ওলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া তলবে ইলমের যত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে তা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই।

فعلمها و أحسن تعليمها ,و أدبها فأحسن تأديبها

তাকে ইলম শিক্ষা দিলো এবং উত্তম শিক্ষা দিলো, আর তাকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিলো এবং উত্তম শিক্ষা দিলো। (সহীহ বুখারী)

এই হাদীছে স্বয়ং পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যেন তার তাদের অধীন নারীদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে, আর এর বিনময়রূপে জান্নাতের ঘোষণা এসেছে।

বর্ণিত আছে যে, জনৈকা স্ত্রীলোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষেরা তো আপনার উপদেশ এককভাবে নিয়ে গেলো। সুতরাং আমাদের জন্য আপনার একটি দিন নির্ধারণ করে দিন যখন
শুধু আমরা আপনার কাছে আসবো। আপনি আমাদের ঐ ইলম থেকে শিক্ষা দান করবেন যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দান করেছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আবেদন গ্রহণ করে বললেন, তোমরা অমুক অমুক দিন একত্র হও। (সহীহ বুখারী, ইলম অধ্যায়)

এ হাদীছ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে যে, ইলম অর্জনের জন্য নবীর কাছে যেমন নারীদের আলাদা সময় পাওয়ার হক ছিলো তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত ওয়ারিছীনে নবীর কাছেও সেটা পাওয়া তাদের হক।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাহতুল মিমিনীনের লেখা শেখার ব্যবস্থা করেছিলেন বলেও সীরাতের কিতাবে প্রমাণ রয়েছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফছা (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্য স্ত্রীছাহাবী লিখতে জানতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) ইলম ও ফিকহের ক্ষেত্রে এবং সমকালীন শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তা বোঝা যায় নিমেণাক্ত বর্ণনা থেকে।

হযরত ওরওয়া বিন যোবায়র তাঁর খালা সম্পর্কে বলেন, ফারায়েযের ইলম, হালাল-হারামের মাসায়েল এবং কোরআনের ইলমের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা.)-এর চেয়ে বড় আলিম আমি দেখিনি। প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত মসরূক বলেন, আল্লাহর কসম, বড় বড় ছাহাবাকে আমি তাঁর কাছে মীরাছের মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি।

হযরত ওরওয়া আরো বলেন,

সাহিত্য, কবিতা, চিকিৎসা এবং আরবজাতির ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী আমি দেখিনি।

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রেও তার মর্যাদা ছিলো অনেক পুরুষ সাহাবীরও উপরে।

জ্ঞানচর্চা ও তলবে ইলমের ক্ষেত্রে আরো বহু স্ত্রীছাহাবীর নাম এখানে উল্লেখ করা যায়। যেসকল স্ত্রীছাহাবী কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, হযরত খানসা, সু'দা বিনতে কোরায়য (হযরত উছমান রা.-এর খালা), নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধবোন শায়মা, আতেকা বিনতে যায়দ ও অন্যান্য। বর্ণিত আছে যে, হযরত খানসা (রা.)-এর কবিতা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করতেন, আর হাতে ইশারা করে বলতেন, হে খানসা, আরো কিছু শোনাও। (ইলইসাবা, ইবনে হাজার ৪/২৪৮৬-২৪৮৭)

নারীসমাজের ইলমচর্চার এ ধারা পরবর্তী যুগেও অব্যাহত ছিলো।

কারীমাহ আলমারওয়াযিয়্যাহ ছিলেন অনেক উচ্চস্তরের মুহাদ্দিছাহ। বহু মুহাদ্দিছ পর্দার আড়াল থেকে তাঁর কাছ থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। ইবনে আসাকির বলেন, ইমাম বুখারী যেসকল নারী মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ তাঁর নারীশায়খ-এর সংখ্যা ছিলো আশির উপরে। ইমাম যাহাবী রহ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে যেখানে বহু পুরুষ বর্ণনাকারী মিথ্যাচারী বলে অভিযুক্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন দোষ-দুর্বলতার কারণে পরিত্যক্ত বলে সাব্যস্ত হয়েছেন সেখানে কোন নারীবর্ণনাকারী অভিযুক্ত বা পরিত্যক্ত সব্যস্ত হননি। হানাফী ফিকহ-এর সুপসিদ্ধ কিতাব 'বাদায়েউস সানায়ে'-এর রচয়িতা আল্লামা কাসানী রহ, এর স্ত্রী হলেন ফাতেমা। তিনি এত উচ্চস্তরের ফকীহা ছিলেন যে, তিনি, তাঁর পিতা আল্লামা সমরকন্দী ও স্বামী আল্লামা কাসানী, এই তিনজনের সম্মিলিত স্বাক্ষরে ফতোয়া জারি করা হতো।

এমনকি হিন্দুস্তানের ইতিহাসেও এর নমুনা রয়েছে। ভুপালের প্রসিদ্ধ আলিম মুফতি মাওলানা আব্দুল কাইঊম (রহ.)-এর স্ত্রী ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লহ দেহলবী (রহ.)-এর খান্দানের নারী। তিনি এত বড় আলিমা ছিলেন যে, কোন কঠিন মাসআলার সম্মুখীন হলে মুফতী আব্দুল কাইঊম (রহ.) বলতেন

অপেক্ষা করো, আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে বলছি।

সালাফ ও খালাফের এই ধারাকে পুনর্জীবিত করা এখন সময়ের দাবি।

ওলামায়ে কেরামের নিকট নিবেদন, তারা যেন নারীদের শিক্ষা ও তারবিয়তের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন এবং উপযুক্ত ও আদর্শ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

জীবিকার দায় থেকে অব্যাহতি

মূল আলোচনায় ফিরে আসি। ইসলাম নারীসমাজের প্রতি অনেক বড় একটি ইহসান এই করেছে যে,

পরিবারের জীবিকা ও যাবতীয় অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দান করেছে এবং তা পুরুষের কাঁধে অর্পণ করেছে।

নারীদের ঘরের বাইরে যাওয়া

নারীদের ঘরের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের সূরা আহযাবে বলা হয়েছে,

> “ "হে নবী, বলুন আপনার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে এবং বিশ্বাসী নারীদেরকে যে, তাঁরা যেন তাঁদের বহিরাবরণ পরে থাকে (যখন বাইরে যাবে)। এটা তাঁদের পরিচিতির অত্যন্ত উপযোগী। (তাঁরা যেন পরিচিত হয় বিশ্বাসী নারী হিসেবে) তাহলে আর অহেতুক উৎপিড়ীত হবে না। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল দয়াবান।"৩৩:৫৯ ”

সাধারণত ইসলাম সর্বাবস্থায় নারীদের ঘরে আবদ্ধ করে রাখার কথা বলে না। এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত,

> “ "রাসূল বলেন, অবশ্যই প্রয়োজনে তোমাদের (নারীদের) বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।"৪৪৩৬ ”

তবে, সেক্ষেত্রে দূর যাত্রা হলে সাথে মাহরাম নিতে হবে। মাহরাম হল সাথে কোনো পুরুষ অভিভাবক থাকা। এ সম্পর্কে সহীহ বোখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত,

> “ "রাসূলুল্লাহ বলেছেন, মাহরামের উপস্থিতি ব্যতীত কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি ওঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্ত্রী হজ্বে বেরিয়ে গেছে। এবং অমুক অমুক জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আমার নাম তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। নবী বললেন, ফিরে যাও এবং স্ত্রীর সাথে হজ্ব সমাপন কর।"৪৮৫৭ ”

পর্দা

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে নারী-পুরুষ উভয়েরই তাদের নিজ নিজ রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্যকে একে অপরের চোখ থেকে আড়ালে রাখার জন্য ইসলামে যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছে, তাকে হিজাব বা পর্দা বলা হয়। ইসলাম মুসলমান নারী এবং পুরুষ উভয়ের ওপর পর্দা ফরজ করে দিয়েছে। এ সম্পর্কে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের সূরা নূরে বলা হয়েছে,

> “ "প্রত্যেক বিশ্বাসী পুরুষদের বল, তাঁরা যেন তাঁদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে। এবং তাঁদের লজ্জাস্থান সমূহ হেফাজত করে। এটাই তাঁদের জন্য উত্তম পন্থা। আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত। এবং বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তাঁরা যেন তাঁদের দৃষ্টি অবনত রাখে। এবং তাঁদের লজ্জাস্থান সমূহের সংযত সংরক্ষণ করে এবং তাঁদের দৈহিক সৌন্দর্য ও অলংকারের প্রদর্শনী না করে। তবে, অনিবার্য ভাবে যা উন্মুক্ত থাকে (তাতে কোনো দোষ নেই)। তাঁরা যেন তাঁদের বক্ষের ওপরে চাদর ঝুলিয়ে দেয় এবং তাঁদের স্বামী, তাঁদের পিতা, শ্বশুর এবং সন্তানদের ছাড়া তাঁদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। ”

ইসলামের গবেষকেরা এই আয়াত সমূহ এবং এ সংক্রান্ত হাদিসের ওপর ভিত্তি করে, নারী-পুরুষের পর্দার একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক হল, কমপক্ষে নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা। আর নারীর জন্য বাধ্যতামূলক হল, কমপক্ষে দুই হাতের কব্জী এবং মূখ মন্ডল ছাড়া পুরো শরীর ঢেকে রাখা। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন, তাও ঢেকে রাখতে হবে।কারন চেহারা হচ্ছে সৌন্দর্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ । এছাড়া পর্দার বাকি শর্তগুলো হল: পরিধেয় পোশাক ঢিলেঢালা হবে। যেন দেহের মূল কাঠামো প্রকাশ না পায়। পোশাক এত পাতলা ও স্বচ্ছ হবে না, যাতে ভেতরটা দেখা যায়। পোশাক বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করার মত আকর্ষণীয় হবে না। পোশাকের ধরন বিপরীত লিঙ্গের মত হবে না। এবং পোশাকের ধরন অবিশ্বাসীদের মত হবে না। এই শর্তগুলো নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একই রকম।

ইসলামে নারীর অবদান

ইসলামের ইতিহাসে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়ে নারী আর্থসামাজিক উন্নয়নের অংশীদার হয়েছেন। হাজার বছরের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে নারীরা পর্দা-শালীনতা বজায় রেখে জ্ঞানচর্চা, সমাজসেবা ও অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন এবং পুরুষদের মতোই যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন।মহানবী (সা.) বিভিন্নভাবে নারীদের জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর যুগে অনেক প্রাজ্ঞ নারী সাহাবি ছিলেন। নবীপত্নী আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞানের কাছে অনেক অভিজ্ঞ সাহাবিও হার মেনেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অসামান্য অবদান নিয়ে ৪৩ খণ্ডের বিশাল এক বিশ্বকোষ রচনা করেছেন কেমব্রিজ ইসলামিক কলেজের ডিন ড. মুহাম্মদ আকরাম নদভি। তাতে ১০ হাজারের বেশি নারী হাদিসবিশারদ ও শিক্ষাবিদের জীবন-কর্ম-অবদান তুলে ধরা হয়।

মহানবী (সা.)-এর যুগে নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। চিকিৎসক হিসেবেও নারী ব্যাপক অবদান রাখেন। নারী সাহাবি উম্মে সুলাইমের নেতৃত্বে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা দেওয়া হতো। সে যুগে কৃষিকাজেও নারীর অংশগ্রহণ ছিল। হস্তশিল্পের মাধ্যমেও নারীরা অর্থ উপার্জন করতেন। ওমর (রা.)-এর যুগে প্রখ্যাত আইনজ্ঞ শিফা বিনতে আবদুল্লাহকে আদালতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়। আলী (রা.)-এর যুগে আয়েশা (রা.)-এর ভূমিকা নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জোবায়দা এবং সুলতান মালিক শাহর স্ত্রী তুরকানের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো মুসলিম নারীর সমাজসেবার অনন্য উদাহরণ। একাদশ শতাব্দীতে মুসলিম নারীরা দামেস্কে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১২টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা নারীদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। তা ছাড়া, স্পেনের আয়েশা বিনতে আহমদ ছিলেন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার, লুবনি ছিলেন ভাষাবিদ এবং রাবিয়া কাসিসাহ ছিলেন প্রসিদ্ধ বক্তা।

সমাজে নারীর অসামান্য অবদানের পরিপ্রেক্ষিতেই বিখ্যাত মুসলিম স্কলার ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, সমাজের অর্ধেকই নারী। বাকি অর্ধেকেরও জন্ম দেন নারী। তাই নারীরাই যেন পুরো সমাজ।

ইসলাম প্রচারে নারীদের দায়িত্ব

ইসলাম প্রচারে পুরুষদের মতো নারীদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। দ্বীন তথা ইসলামের প্রচার-প্রসারে নারীদের যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মানবজীবনে পূর্ণ দ্বীন বাস্তবায়ন এবং ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা অর্জন সম্ভব। এ প্রসঙ্গে হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই নারীরা হলো পুরুষদের সহোদরা।'

এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিদের মধ্যে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও ছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর জীবন এক মহিমান্বিত জীবন। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যেসব নারী জীবনের মায়া ত্যাগ করে সোনালি ইতিহাস গড়ে গেছেন, তাদের অনুসৃত পথেই বর্তমানের নারীদের চলতে হবে। সে পথে চলার জন্য সম্মিলিতভাবে সব নারীকে আহ্বান করতে হবে। তাহলেই নারী জীবনে পূর্ণতা আসবে। তাই নারীদের প্রধানতম কর্তব্য হলো সমাজের বিভিন্ন মহলের নারীদের কাছে ইসলামের অমিয় বাণী পৌঁছানো, দ্বীনের আলো ছড়ানো।

দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে হলে দ্বীনকে প্রচারের মাধ্যমে মজবুত করতে হবে। হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও সফলতা আল্লাহর আদেশ পালন ও সুন্নতওয়ালা কাজের মধ্যে নিহিত। ইতিহাস সাক্ষী, বহু নারী আল্লাহর রাস্তায় মেহনতের মাধ্যমে অলংকৃত করে গেছেন এই দ্বীনকে। যুগশ্রেষ্ঠ সেই নারীদের সংখ্যা কিন্তু কম নয়।

বলা হয় নারীর সাধনাই হলো মহান ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি। নারী সাহাবিরা দৃঢ় মনোবল, ধৈর্য, আগ্রহ ও অসীম সাহসিকতার বলে ইসলাম ধর্মের খেদমতে অপূর্ব দৃঢ়তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, যা ইতিহাসে বিরল। ঐতিহাসিক মহীয়সী নারীরা হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন রক্ষার্থে প্রাণপণ যুদ্ধ করে শত্রুদের মোকাবিলা করেছিলেন।

তাই আজ প্রত্যেক সচেতন নারীকে ভাবতে হবে, দ্বীনের জন্য, ইসলামের জন্য আমরা কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেছি? আল্লাহর দেওয়া জীবনকে কোন পথে ব্যয় করছি? সেই সঙ্গে মনে দ্বীনের দাওয়াতের চিন্তাও করতে হবে। কীভাবে, কোন পথে ছোট-বড়, ধনী-গরিব, ফকির-মিসকিন, অহংকারী-বদমেজাজি এবং দ্বীনের প্রতি উদাসীন মা-বোনদের কর্ণকুহরে শাশ্বত ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো যায়? ইসলামের পথে সে তার চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি-বিবেক, জান-মাল ও সময়কে ব্যয় করার লক্ষ্যে কাজ করবে কোন পদ্ধতিতে দাওয়াত দিলে?

যে যত বেশি ইসলাম প্রচার করবে, তার ইমান ততই দৃঢ় হবে, আমল করা সহজ হয়ে যাবে। সে ইমানদার ও আমলওয়ালা হয়ে যাবে। তার অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা দূরীভূত হয়ে তার জন্য আল্লাহ ও তার রাসুলের পথে চলা অনেকাংশেই সহজ হয়ে যাবে। নারীদের এমন ছোট ছোট প্রচেষ্টায় গড়ে উঠতে পারে সোনালি সমাজব্যবস্থা।

নারী কোনো অবহেলার পাত্র নয়, নারীকে অবলাও মনে করে না ইসলাম। বরং ইসলাম বলে, হে নারী সম্প্রদায়! জেনে রাখুন একজন নারীর ভেতর ৭০ জন ওলির মর্যাদা ও ক্ষমতা লুকিয়ে আছে।' এই মর্যাদার দরুন নারীরাই পারে ইসলামের শিক্ষায় সুন্দর, শিক্ষিত ও আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে।

এটা ঠিক যে, নারীদের জন্য দাওয়াতি আমল শুরু করা খুব সহজ নয়। তবে শুরু করলে সফলতা আসবে। এ ক্ষেত্রে হতাশ হলে চলবে না; নিজেকে অক্ষম মনে করা যাবে না। বারবার তার দুয়ারে কড়া নাড়তে

হবে। একসময় সে সাড়া দেবেই। এরপর সেও কড়া নাড়বে আরেকজনের দুয়ারে। এমনিভাবেই একের পর এক জয়যাত্রা এগিয়ে যাবে বিশ্বময়-প্রতিটি মানুষের হৃদয় দুয়ারে। আর দুনিয়ায় বইবে জান্নাতের সুবাতাস-শুধু নারীদের কল্যাণে।

নারীদের ধর্ম প্রচারে ইসলাম কী বলে

ইসলাম নারীকে মানবসভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং মৌলিক অধিকার ও সামাজিক মর্যাদায় পুরুষের সমান অংশীদার মনে করে। মানবসভ্যতার বিকাশে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।' (সুরা: হুজরাত, আয়াত: ১৩)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যে ঈমানের সঙ্গে ভালো কাজ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণ অবিচার করা হবে না।' (সুরা: নিসা, আয়াত: ১২৪)

ইসলাম প্রচারে পুরুষদের মতো নারীদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। দ্বীন তথা ইসলামের প্রচার-প্রসারে নারীদের যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মানবজীবনে পূর্ণ দ্বীন বাস্তবায়ন এবং ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা অর্জন সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই নারীরা হলো পুরুষদের সহোদরা।'

পবিত্র কোরআনে এমন একাধিক নারীর উল্লেখ রয়েছে, যারা মানব ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মহান আল্লাহ বলেছেন, '(বহু) পুরুষ নারীর সমতুল্য নয়।' (সুরা: আলে-ইমরান, আয়াত: ৩৬)

এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিদের মধ্যে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও ছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর জীবন এক মহিমান্বিত জীবন। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যেসব নারী জীবনের মায়া ত্যাগ করে সোনালি ইতিহাস গড়ে গেছেন, তাদের অনুসৃত পথেই বর্তমানের নারীদের চলতে হবে। সে পথে চলার জন্য সম্মিলিতভাবে সব নারীকে আহ্বান করতে হবে। তাহলেই নারী জীবনে পূর্ণতা আসবে।

তাই নারীদের প্রধানতম কর্তব্য হলো সমাজের বিভিন্ন মহলের নারীদের কাছে ইসলামের অমিয় বাণী পৌঁছানো, দ্বীনের আলো ছড়ানো।

দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে হলে দ্বীনকে প্রচারের মাধ্যমে মজবুত করতে হবে।হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও সফলতা আল্লাহর আদেশ পালন ও সুন্নতওয়ালা কাজের মধ্যে নিহিত। ইতিহাস সাক্ষী, বহু নারী আল্লাহর রাস্তায় মেহনতের মাধ্যমে অলংকৃত করে গেছেন এই দ্বীনকে। যুগশ্রেষ্ঠ সেই নারীদের সংখ্যা কিন্তু কম নয়।বলা হয় নারীর সাধনাই হলো মহান ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি। নারী সাহাবিরা দৃঢ় মনোবল, ধৈর্য, আগ্রহ ও অসীম সাহসিকতার বলে ইসলাম ধর্মের খেদমতে অপূর্ব দৃঢ়তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, যা ইতিহাসে বিরল।

ঐতিহাসিক মহীয়সী নারীরা হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন রক্ষার্থে প্রাণপণ যুদ্ধ করে শত্রুদের মোকাবিলা করেছিলেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সাধ্যানুযায়ী দাওয়াতি কাজ করা তথা ইসলাম প্রচারে অবদান রাখা ফরজ। তবে সকলেই

অবশ্যই ইসলামি শরিয়তেরর গণ্ডীর মধ্যে থেকে তা করবে। ইসলামি শরিয়তের বিধান লঙ্ঘন করে দাওয়াতি কাজ করা বৈধ নয়।

যা হোক, আধুনিক যুগে পর্দা রক্ষা করে এবং শরিয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে নারীদেরও ইসলাম প্রচারে অংশ গ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

নিম্নে মহিলাদের দাওয়াতি কার্যক্রম করার দশটি পদ্ধতি ও ধারণা পেশ করা হল:

১. নিজ স্বামী/ সন্তান-সন্ততিকে ইসলামের সঠিক আদর্শ শিক্ষা দেয়া। সন্তানদেরকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতি কাজ আর নেই। একজন নারী তার সন্তানদের প্রথম শিক্ষক এবং মায়ের কোল সন্তানের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

সুতরাং প্রতিটি মা যদি তার সন্তানকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলেন তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে এই শিক্ষা তার জীবনে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ।

২. নিজ আবাস গৃহে পার্শ্ববর্তী মহিলাদেরকে ইসলাম শিখানোর ব্যবস্থা করা। যেমন: সাপ্তাহিক বা মাসিক দরসের ব্যবস্থা। তবে এ ক্ষেত্রে বাড়িতে আগন্তুক মহিলাদের জন্য পূর্ণ পর্দার বন্দোবস্ত করা জরুরি।

৩. স্বামী বা মাহরাম সহকারে দূরে কোথাও দাওয়াতি কাজের জন্য গমন করা। কিন্তু স্বামী বা মাহরাম ছাড়া দূর দূরান্তে দাওয়াতি কাজ করতে যাওয়া বৈধ নয়; অন্য মহিলাদের সাথে হলেও। যেমনটি বর্তমানে অনেক স্থানে দেখা যায়।

৪. মহিলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত হলে ছাত্রীদের মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম করা।

৫. ঘরে বসে ইসলাম বিষয়ে লেখা ও তা বই/লিফলেট আকারে প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় ছাপানোর জন্য পাঠানো।

৬. ঘরে বসে ওয়েবসাইট/ব্লগ পরিচালনা করা ও তাতে ইসলাম বিষয়ে লেখালেখি করা।

৭. ফেসবুক, টুইটার সহ বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেয়া।

৮. নিজে বই-পুস্তক লেখার যোগ্যতা না রাখলে অর্থ দিয়ে কোন ভালো মানের আলেমের লেখা বই ছাপিয়ে সেগুলো বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।
৯. মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ছাত্রী হোস্টেল, হসপিটাল বা নিজস্ব কর্মস্থলে ছাত্রী/মহিলা সহকর্মীদের মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১০. মোবাইল, মেমোরি কার্ড বা ফ্লাশের মাধ্যমে সহীহ আকিদা নির্ভর আলিমদের বিভিন্ন লেকচার অন্যদের সাথে শেয়ার করা অথবা ভালো মানের বক্তৃতাগুলো বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করে সেগুলো ছড়িয়ে দেয়া।

তবে সর্বাবস্থায় মনে রাখতে হবে যে, দাওয়াতি কাজে এত বেশি মগ্ন থাকা উচিৎ নয় যে, স্বামী-সন্তানদের উপর অপরিহার্য হক আদায়ে গাফলতি সৃষ্টি হয়।মহান রাব্বুল আ'লামীন এসব পূর্ণাঙ্গরুপে পালন করার তাওফিক সকলকে দান করুন। আমীন।

নারীর অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে একটি দায়িত্ব হল স্বামীর খেদমত করা। এতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন '
যে নারী এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, তার জন্য জান্নাত অনিবার্য হয়ে যায়।' (তিরমিযী : হাদীস ১১৬১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি স্বামী স্ত্রীকে তার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার জন্য আহ্বান করা সত্ত্বেও সে তার আহ্বানে সাড়া না দেয় এবং এ অবস্থায় স্বামী অসন্তুষ্ট হয়ে রাত অতিবাহিত করে তাহলে এ স্ত্রীর প্রতি ফেরেশতাগণ ভোর পর্যন্ত লানত করতে থাকেন। (সহীহ বুখারী : হাদীস ৩২৩৭)

দাওয়াত

নারীদের ওপর দাওয়াত শরীয়তের পক্ষ থেকে কর্তব্য কি না? বর্তমানে অনেকে এ প্রশ্ন তোলে থাকে। এ প্রশ্ন মূর্খতা প্রসূত। আমরা যদি আল্লাহ তাআলার নির্দেশনার দিকে তাকাই তখন দেখতে পাই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

নারী পুরুষের যে কেউ ঈমান অবস্থায় নেক আমল করবে আমি অবশ্যই তাকে শান্তিময় জীবন দান করব, এবং আখেরাতে তার কৃতকর্মের উত্তম প্রতিদান দেব। (সূরা নাহল : আয়াত ৯৭) এখানে ঈমান অবস্থায় নেক আমল করা যেমন পুরুষদের জন্য খাছ করা হয়নি তেমনি শান্তিময় জীবন বা আখেরাতে উত্তম প্রতিদান শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়নি। নারী-পুরুষ উভয়ে ঈমানের হকদার এবং শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির দাবীদার। সে হিসেবে আমলও উভয়ের ওপর সমানভাবে বর্তাবে। আর দাওয়াত এটি দ্বীনের অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বেশি সাওয়াবের কাজ তাই দাওয়াতী কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ ভীষণ জরুরি আল্লাহ তাআলা বলেনÑহে নবী! আপনি বলে দিন। এই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীরা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই সুস্পষ্ট জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। (সূরা ইউনুস : আয়াত ১০৮) এ আয়াতেও যারা অনুসারী তাদের কথা বলা হয়েছে আমরা জানি একজন পুরুষ যেমন আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এবং দ্বীনের অনুসারী তেমনি একজন নারীও সমান অনুসারী। পুরুষের ওপর যেমন দায়িত্ব তেমন নারীর ওপরও সমান দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন 'তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভালো কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজের নিষেধ করবে এবং তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৪) আল্লাহ তাআলা আরো স্পষ্ট করে বলেন 'মুমিন পুরুষরা ও মু'মিনা নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে।' (সূরা তাওবা : আয়াত ৭১)

রাসূল (সা.)-এর যুগে নারীগণ

দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের ক্ষেত্রে পুরুষ সাহাবী (রাযি.)-এর পাশাপাশি মহিলা সাহাবী (রাযি.) ত্যাগ তিতিক্ষা, কষ্ট-মুযাহাদা, শাহাদতবরণও করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক সময়ে রাসূল (সা.)কে অর্থ, সময় ও সাহস যুগিয়েছেন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাযি.) এপর আমরা দেখতে পাই ইসলামের জন্য প্রথম শহীদ হয়েছেন হযরত সুমাইয়া (রাযি.)। আবু জাহেল তাকে শহীদ করে। শিক্ষা মাসআলা, জিহাদের ক্ষেত্র সহ প্রত্যেক স্থানে আমরা ওই যামানার মহিয়সী রমনীদের আমরা সরব উপস্থিতি দেখতে পাই। শুধু তাই নয় প্রতিটি যুগেই আমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে দেখতে পাই। তারা জান-মাল সময় দিয়ে ইসলামের মহান কাজকে সমুন্নত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। নিজেরাও হয়েছেন সৌভাগ্যের অধিকারী।

ইসলামের স্বর্ণযুগে নানা পেশায় নারী

ইসলামের সোনালি যুগ থেকেই নারীরা আর্থসামাজিক উন্নয়নের অংশীদার হয়েছেন। বিচিত্র পেশায় অংশ নিয়ে সমাজে অবদান রেখেছেন। রাসুল (সা.)-এর যুগ থেকে হাজার বছরের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে নারীরা জ্ঞানচর্চা, সমাজসেবা ও অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা লাভ করেছেন এবং পুরুষদের মতোই যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, পর্দা-শালীনতা ও ইসলামের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি তারা অবশ্যই মান্য করেছেন।
জ্ঞানচর্চা : মহানবী (সা.) বিভিন্নভাবে নারীদের জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সুযোগ দিয়েছেন। মদিনার নারীরা একবার রাসুলের কাছে অভিযোগ করে বলেন, 'পুরুষরা আপনার কাছে আমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের অঙ্গীকার করেন; সেদিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং দিকনির্দেশনা দিলেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১০১)
রাসুলের যুগে অনেক প্রাজ্ঞ নারী সাহাবি ছিলেন। নবীপত্নী আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞানের কাছে তো অনেক অভিজ্ঞ সাহাবিও হার মেনেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অসামান্য অবদান নিয়ে ৪৩ খন্ডের বিশাল এক বিশ্বকোষ রচনা করেছেন ক্যামব্রিজ ইসলামিক কলেজের ডিন ড. মুহাম্মদ আকরাম নদভি। এ গ্রন্থে তিনি ১০ হাজারের বেশি নারী হাদিসবিশারদ ও শিক্ষাবিদের জীবন-কর্ম-অবদান তুলে ধরেন।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব : ইসলামের সোনালি যুগে নারীরা রাজনীতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে না থাকলেও তারা বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং রাজনৈতিক সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আয়েশা (রা.) মুয়াবিয়া ও আলী (রা.)-এর মধ্যকার সংকট নিরসনে এগিয়ে আসেন। তেমনি সাওদা বিনতে আম্মারা বিন আশতার হামদানি তার গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে যান এবং দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন। মুয়াবিয়া (রা.) তাদের দাবি মেনে নেন এবং ইবনে আরতাকে বরখাস্ত করেন। (আকদুল ফারিদ, পৃষ্ঠা : ৩৪৪-৪৬)

সমাজসেবা : সোনালি যুগে নারীরা বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবায়ও অংশ নেন। তারা অসংখ্য শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জোবায়দা দীর্ঘ খাল খনন করে হাজিদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেন। সেলজুক শাসক সুলতান মালিক শাহর স্ত্রী তুরকান বিনতে তুরাজ বাগদাদে তিনটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ ওয়াক্ফ করেন। (তারিখু দাওলাতুল আব্বাসিয়া, পৃষ্ঠা ৯৭)

এ ছাড়া একাদশ শতাব্দীতে মামলুক শাসনামলে মুসলিম নারীরা দামেস্কে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১২টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা নারীদের দ্বারাই পরিচালিত হতো।

ব্যবসা-বাণিজ্য : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। নারী সাহাবি কায়লা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো এক ওমরাহ আদায়কালে মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে আমি তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি একজন নারী। আমি বেচাকেনা করি। আমি কোনো জিনিস কিনতে চাইলে আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাম বলি। এরপর দাম বাড়িয়ে বলতে বলতে আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যে গিয়ে পৌঁছাই। আবার আমি কোনো জিনিস বিক্রি করতে চাইলে কাঙ্ক্ষিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য চাই। এরপর দাম কমাতে কমাতে অবশেষে আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যে নেমে আসি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে কায়লা, এমন করো না। তুমি কিছু কিনতে চাইলে তোমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যই বলো, হয় তোমাকে দেওয়া হবে, নয় দেওয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, তুমি কোনো কিছু বিক্রয় করতে চাইলে তোমার কাঙ্ক্ষিত দামই চাও, হয় তুমি দেবে অথবা দেবে না।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২২০৪)

চিকিৎসা : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারীরা চিকিৎসক হিসেবেও দক্ষতা অর্জন করেন। যারা শৈল্যবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। আয়েশা (রা.) নিজেও চিকিৎসাবিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন। উরওয়া (রহ.) বলেন, 'আমি চিকিৎসাবিজ্ঞানে আয়েশা (রা.) অপেক্ষা দক্ষ মানুষ দেখিনি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, খালা, আপনি এই জ্ঞান কোথা থেকে অর্জন করলেন? তিনি বলেন, আমি মানুষকে রোগীর চিকিৎসা করতে দেখেছি এবং তা মনে রেখেছি।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/১৮২)

সাহাবাযুগে নারী সাহাবি উম্মে সুলাইমের নেতৃত্বে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো। (আবুদাউদ, হাদিস : ১৫৭৫)

মিসরে মুসলিম শাসক কর্তৃক প্রথম আবাসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে নারীরাও চিকিৎসক ও শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ পান। তাদের কেউ কেউ 'মাশিখাতুত তিব' তথা 'মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান' পদেও অধিষ্ঠিত হন। (আহমদ ইসা বেগ, তারিখুল বিমারিস্তান ফিল-ইসলাম)

কৃষিকাজ : মহানবী (সা.)-এর যুগে নারীরা কৃষিকাজেও অংশগ্রহণ করতেন। আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে দীর্ঘ এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, 'যখন জোবায়ের আমাকে বিয়ে করেন, তখন তার কোনো ধন-সম্পদ ছিল না। এমনকি কোনো স্থাবর জমিজমা, দাস-দাসীও ছিল না; শুধু কুয়া থেকে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও একটি ঘোড়া ছিল। আমি তার উট ও ঘোড়া চরাতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম, কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে পারতাম না।... রাসুল (সা.) জোবায়েরকে একখণ্ড জমি দিলেন। আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতাম। ওই জমির দূরত্ব ছিল প্রায় দুই মাইল।...' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২২৪)

হস্তশিল্প : মহানবী (সা.)-এর যুগে নারীরা হস্তশিল্পের কাজ করেও অর্থ উপার্জন করতেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সে-ই আমার সাক্ষাৎ পাবে যার হাত সর্বাধিক লম্বা'। সুতরাং তারা নিজ নিজ হাত মেপে দেখতে লাগলেন কার হাত বেশি লম্বা। আয়েশা (রা.) বলেন, 'অবশেষে আমাদের মধ্যে জয়নবের হাতই সবচেয়ে লম্বা স্থির হলো। কেননা তিনি হাতের কাজ করতেন এবং দান-খয়রাত করতেন।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬০৯৪)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী রায়িতা (রা.) হস্তশিল্পে দক্ষ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে তা বিক্রি করতেন এবং উপার্জিত অর্থ দান করে দিতেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬০৩০)

অন্যান্য পেশা : স্পেনের অধিবাসী আয়েশা বিনতে আহমদ বিন কাদিম ছিলেন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার। লুবনি ছিলেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রে পারদর্শী। রাবিয়া কাসিসাহ প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। শিফা বিনতে আবদিল্লাহ ছিলেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ। ওমর (রা.) তাকে আদালতের 'কাজাউল হাসাবাহ' তথা 'অ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি কোর্ট এবং ও 'কাজাউস সুক' তথা 'মার্কেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর দায়িত্বে নিয়োগ দেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৫/৭৮)

সমাজে নারীর অসামান্য ভূমিকার প্রশংসা করে তেরো শতকের প্রখ্যাত মুসলিম স্কলার আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'সমাজের অর্ধেকই নারী। বাকি অর্ধেকেরও জন্ম দেন নারী। তাই নারীরাই যেন পুরো সমাজ।

নবীজীর প্রতি নারী সাহাবীদের ভালোবাসা

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ। এছাড়া ঈমান পূর্ণতা পায় না। ঈমানের পূর্ণতার জন্য নবীজীকে শুধু আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। সেইসাথে নবীজীকে ভালোবাসতে হবে হৃদয় থেকে। এ ভালোবাসা ঈমানের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। ঈমানকে সজীব ও জীবন্ত করে তোলে। সেইসাথে শরীয়তের আহকাম ও বিধি-বিধান মানাও সহজ করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ.

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান ও সকল মানুষ থেকে প্রিয় হব। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৫

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণীকে সাহাবায়ে কেরাম রা. হৃদয় দিয়ে বরণ করেছিলেন এবং বাস্তব জীবনে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলেন।

নবীজীকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে নারী সাহাবীগণও ছিলেন অগ্রগামী। তারাও নবীজীকে ভালোবেসেছেন হৃদয় থেকে। সে ভালোবাসা কখনো মুখে উচ্চারিত হত। কখনো বিভিন্ন কর্ম ও আচরণে প্রকাশ পেত। নিম্নে নারী সাহাবীদের ভালোবাসার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হল।

উহুদ যুদ্ধে প্রাথমিক জয়ের পর এক পর্যায়ে মুসলমানগণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। একে একে শহীদ হতে থাকেন অসংখ্য সাহাবী। মদীনা তখন শোকে স্তব্ধ। কারো বাবা নেই। কারো ভাই নেই। কেউবা স্বামী হারিয়েছেন।

বনু দীনারের এক নারী। উহুদ যুদ্ধে তার স্বামী, বাবা ও ভাই শহীদ হন। এসব আপনজনদের শাহাদাতের সংবাদ তাকে দেওয়া হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ কেমন আছেন? উত্তরে বলা হল, তিনি ভালো আছেন। এরপর এ নারী সাহাবী যা বললেন, তা আজ ১৪০০ বছর

পরও আলো ও সৌরভ ছড়াচ্ছে ইতিহাসের পাতায়। আশেকীনে রাসূলদের উদ্দীপ্ত করছে নতুন চেতনায়। নবীজীর সুস্থতার খবর শুনে সেই নারী সাহাবী বলেছিলেন-

!كُلّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ

(নবীজী ভালো আছেন। সুস্থ ও জীবিত আছেন। তাহলে মনে আর দুঃখ নেই।) সব মসীবতই তাহলে তুচ্ছ! -সীরাতে ইবনে হিশাম ৩/৬২

সুবহানাল্লাহ! কী দীপ্ত উচ্চারণ! ভালোবাসার কী গভীর অনুরণন!! বাবা নেই, ভাই নেই, স্বামীকেও হারিয়েছেন। একসাথে এত আপনজন হারিয়ে মানুষ কতটা শোকসন্তপ্ত ও বিধ্বস্ত হতে পারে তা কল্পনা করাও কঠিন। কিন্তু নবীজীর প্রতি কতটা গভীর ভালোবাসা থাকলে এমন বিপর্যয়ের মুহূর্তেও উচ্চারিত হতে পারে-

!كُلّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ

নবীজী ভালো আছেন। সুস্থ ও জীবিত আছেন। তাহলে মনে আর দুঃখ নেই। সব মসীবতই এখন তুচ্ছ!

হাঁ, সাহাবীগণ এতটাই ভালোবাসতেন নবীজীকে। সে ভালোবাসার সামনে সবচে আপনজনদের ভালোবাসাও ছিল তুচ্ছ।

নবীজীর সাহায্য-সহযোগিতা করা

সাহাবায়ে কেরামের কাছে নবীজী ছিলেন প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাই নবীজীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা ছিল তাদের দিলের তামান্না। নবীজীর গায়ে কোনো আঁচড় লাগুক অথবা পায়ে কোনো কাঁটা বিঁধুক এটাও তারা সহ্য করতে পারতেন না। হযরত খুবাইব রা.-এর শাহাদাতের পূর্বের সেই সাহসী উচ্চারণ এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। নবীজীর সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে নারী সাহাবীগণও কোনো অংশে কম ছিলেন না।

হযরত নাসীবা বিনতে কা'ব রা.। উম্মে উমারা নামেই যিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। সাহসিকতায় অনেক পুরুষকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। উহুদ যুদ্ধে তার একটি ঘটনা। যুদ্ধপরিস্থিতি তখন পুরো বদলে গেছে। প্রাথমিক জয়ের পর এখন কাফেরদের পাল্লা ভারী। মুসলমানরা এদিক সেদিক ছুটে যাচ্ছে। সে মুহূর্তে নবীজীর সামনে দশজন মানুষও ছিল না। উম্মে উমারা বলেন-

فَقُمْتُ أُبَاشِرُ الْقِتَالَ، وَأَذُبّ عَنْهُ بِالسّيْفِ، وَأَرْمِي عَنِ الْقَوْسِ.

আমি তখন যুদ্ধে নেমে পড়লাম। তরবারী দিয়ে নবীজীকে রক্ষা করছিলাম আর তীর ছুড়ছিলাম। -সীরাতে ইবনে হিশাম ৩/৪৫

যুদ্ধে উম্মে উমারার ছেলে আবদুল্লাহও নবীজীকে রক্ষা করার জন্য প্রচ- যুদ্ধ করছিলেন। হঠাৎ একটি আঘাত এসে লাগে তার উপর । সাথে সাথে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল। কোনোভাবেই রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না। উম্মে উমারা তখন একটি পট্টি দিয়ে জখমের স্থান বেঁধে দিয়ে বললেন, যাও বেটা, শত্রুর সাথে আবার গিয়ে যুদ্ধ কর। মায়ের এই উৎসাহ বিপুল প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিল আবদুল্লাহর মনে। মা-বেটার কথোপকথনের এই দৃশ্য দেখে নবীজী বলেছিলেন-

وَمَنْ يُطِيقُ مَا تُطِيقِينَ يَا أُمّ عُمَارَةَ!

হে উম্মে উমারা! তুমি যা পেরেছ তা আর কে পারবে! -তবাকাতে ইবনে সাদ ১০/৩৮৫; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৩/৫১৬

নবীজীর প্রতি পূর্ণ সমর্পণ

নবীজীর প্রতি নারী সাহাবীদের কী পরমাণ আস্থা ছিল এবং তারা নবীজীর জন্য কী পরিমাণ সমর্পিত ছিলেন তা একটি ঘটনা দ্বারাই বুঝা যাবে।

বিয়ে সবার জীবনেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি সুখী সংসার, একজন মনের মত জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী সবারই হৃদয়ের স্বপ্ন। তবে নারীদের জীবনে এ স্বপ্নের মাত্রা অবশ্যই বেশি। জীবনের এমন স্পর্শকাতর সিদ্ধান্তও নবীজীর হাতে পূর্ণ ন্যস্ত করার উজ্জ্বল ঘটনা আলো করে আছে আমাদের ইতিহাসের পাতা।

হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েস রা. ছিলেন হিজরতকারী নারীদের অন্যতম। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী। অন্যদিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা ইবনে যায়েদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে ফাতিমা বিনতে কায়েস রা.-এর সাথে কথা বলেছিলেন। হযরত ফাতেমা রা. বলেন, আমি নবীজীর এ বাণী শুনেছিলাম-

مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ.

যে আমাকে ভালোবাসে সে যেন উসামাকেও ভালোবাসে।

তাই নবীজী যখন উসামা রা.-এর সাথে বিয়ের ব্যাপারে আমার সাথে কথা বললেন, আমি তখন বললাম-

أَمْرِي بِيَدِكَ، فَانْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ

আমার বিষয় আপনার হাতে সোপর্দ করলাম, আপনি যার সাথে ইচ্ছে আমাকে বিয়ে দিন। -সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৩২৩৭

হযরত জুলাইবিব রা.। নবীজীর কাছের একজন সাহাবী। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, জুলাইবিব! তুমি বিবাহ করবে না? জুলাইবিব রা. তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অর্থসম্পদ ও বংশীয় আভিজাত্য বলতে কিছুই নেই। কে আমার কাছে তার মেয়ে বিবাহ দেবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এক আনসারীকে তার মেয়ের জন্য জুলাইবিবের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। আনসারী তার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত জানানোর কথা বললেন। স্ত্রীর সাথে কথা বললে তিনি কোনোভাবেই এ বিয়ের জন্য রাজী হচ্ছিলেন না। তবে তার কন্যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম শুনেছিল। একীন ও বিশ্বাসের সুদৃঢ় পাহাড় তার হৃদয়ে প্রোথিত ছিল। তাতে প্রবাহিত ছিল নবীপ্রেমের স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা। তাই বাবাকে বললেন, আপনারা রাসূলুল্লাহর পয়গামকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন? না, এটা কখনই হতে পারে না। আমি জুলাইবিবকে বিয়ে করব। অবশেষে বিবাহ হল এবং ঘর আলোকিত করে একটি সন্তান জন্ম নিল। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২৩৯৩

নবীজীর আদেশ পালন

কারো প্রতি ভালোবাসার গুরুত্বপূর্ণ দাবি হচ্ছে তার আদেশ মেনে চলা। তার চিন্তা ও আদর্শকে জীবনে ধারণ করা। নারী সাহাবীগণ নবীজীর প্রতি যে গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন তা তাদের কর্ম ও আমলের মাধ্যমেও প্রকাশ পেত।

নবীজী একবার মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। দেখলেন নারী-পুরুষ পাশাপাশি পথ চলছে। তখন (নারীদের লক্ষ্য করে নবীজী বললেন) তোমরা পুরুষদের পেছনে থাক। এবং পথের মাঝখানে না হেঁটে একপাশ দিয়ে হাঁট। এরপর নারীদের এমন অবস্থা হয়েছিল যে, তারা রাস্তার পাশ দিয়ে এভাবে হাঁটতেন যে, তাদের কাপড় রাস্তার পাশের দেয়ালের সাথে লেগে যেত। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫২৭২

একবার হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রা.-এর ভাই ইনতেকাল করল। মৃত্যুর পর চতুর্থ দিন তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করে বললেন, সুগন্ধি ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন আমার ছিল না। তবে আমি নবীজীর কাছে শুনেছি, কোনো নারীর জন্য স্বামী ছাড়া অন্যের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। শুধু এ হুকুম পালনের জন্যই আমি এমন করেছি। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২২৯৯

নবীজীর ভালোবাসায় এমনই আলোকোজ্জ্বল ছিল নারী সাহাবীদের জীবন। নবী প্রেমের অসীম আকাশে তাঁরা জ¦ল জ¦ল করছেন নক্ষত্রের মত। নবীজীর প্রতি তাদের যে গভীর ভালোবাসা ছিল, আনুগত্যের যে পরাকাষ্ঠা তাঁরা প্রদর্শন করেছেন, কাগজের বুকে কলমের কালি দিয়ে তার পূর্ণ চিত্র আঁকা সম্ভব নয়। এ প্রবন্ধে তাদের আলোকিত জীবনের কিছু দিক নিয়ে সামান্য আলোচনা করা হল। কিছু ঘটনা তুলে ধরা হল। এগুলো আমাদের জন্যও হতে পারে আলোর মশাল। যদি থাকে উন্মেলিত চোখ ও জাগ্রত হৃদয়।

উহুদ যুদ্ধে নারী সাহাবির বীরত্ব

উহুদ যুদ্ধে নারী সাহাবিদের বীরত্ব ছিল ঈর্ষণীয়।উম্মে আম্মারাহ নুসাইবাহ বিনতে কাব (রা.) নামের এক অসাধারণ নারী সাহাবি অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরিচয় দেন। তিনি আয়েশা (রা.) ও অন্য মুসলিম নারীদের সঙ্গে শুশ্রূষাকারিণী রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আহত সৈনিকদের পানি সরবরাহ এবং তাদের অন্যান্য প্রকার সেবাশুশ্রূষা করছিলেন।

এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন যে, মুসলমানরা পরাজিত হয়েছেন এবং কুরাইশ সৈন্য রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। এ সংবাদ শোনামাত্র উম্মে আম্মারাহ (রা.) কাঁধের মশক ও হাতের পানপাত্র ছুড়ে ফেলেন।

ওই সময় মুষ্টিমেয় ভক্ত প্রাণপণ করে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ রক্ষা করছিলেন। উম্মে আম্মারাহ (রা.) সিংহীর ন্যায় বিক্রম সহকারে সেখানে উপস্থিত হন এবং বিশেষ ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্য সহকারে তীর বর্ষণ করে কুরাইশদেরকে ধ্বংস করতে লাগলেন।

এক সময় তিনি ইবনু কামিয়ার সামনে পড়ে গেলেন। ইবনু কামিয়া তার কাঁধের ওপর এত জোরে তরবারির আঘাত করল যে, এর ফলে তার কাঁধ গভীরভাবে জখম হলো। তিনিও তার তরবারি দ্বারা ইবনু কামিয়াকে কয়েকবার আঘাত করলেন। কিন্তু নরাধম দুটি লৌহবর্ম পরিহিত ছিল বলে বেঁচে যায়।

শত্রুদের বর্শা ও তরবারির আঘাতে উম্মে আম্মারাহ নুসাইবাহ বিনতে কাব (রা.)-এর সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত ও জর্জরিত হয়ে পড়ল। কিন্তু এ বীরাঙ্গনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের কর্তব্য পালন করে যেতে লাগলেন। উহুদ যুদ্ধের বর্ণনাকালে স্বয়ং রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ওই বিপদের সময় আমি দক্ষিণে বামে যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেদিকেই দেখি যে, উম্মে আম্মারাহ (রা.) আমাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছেন।

ইসলাম বিশ্বজনীন এক চিরন্তন ও শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে রয়েছে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও সকল অধিকারের স্বীকৃতি।

ইসলাম নারীকে মানবসভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং মৌলিক অধিকার ও সামাজিক মর্যাদায় পুরুষের সমান অংশীদার মনে করে।মুসলিম নারীদের অভিজ্ঞতাবিভিন্ন সমাজের মধ্যে এবং বিভিন্ন সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়।

কুরআন সব মুসলিমকে জ্ঞানঅন্বেষণের প্রচেষ্টা করতে আদেশ দিয়েছে, তাদের লিঙ্গ যাই হোক না কেন। কুরআন ও হাদিস মুসলানদেরকে বারবার পড়তে, চিন্তা-ভাবনা করতে এবং প্রকৃতিতে আল্লাহপ্রদত্ত উপকরণ থেকে শিক্ষা নিতে বারবার তাগীদ দিয়েছে। এছাড়াও নারী-পুরুষ উভইকেই মুহাম্মদ (সাঃ) শিক্ষাঅর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, জ্ঞানঅন্বেষণ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। পুরুষের মত প্রত্যেক নারীই নীতিগত ও ধর্মিয় এমন বাধ্যবাধকতার অন্তর্ভূক্ত। যাতে তিনি জ্ঞানঅন্বেষণ করেন, নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধির চেষ্টা করেন, মননকে সমৃদ্ধ করেন, নিজের মেধা-প্রতিভার চর্চা করেন যাতে তার সুপ্ত সম্ভাবনার দ্বারা নিজে এবং তার সমাজ উপকার লাভ করতে পারে।

ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ নারী

ইসলামের ইতিহাস জুড়ে, অনেক প্রভাবশালী এবং উল্লেখযোগ্য মহিলা রয়েছেন যারা ধর্ম এবং এর শিক্ষাগুলি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। হজরত মুহম্মদ (সা.) বলেন, ‘দুনিয়ার সব নারীর মধ্যে চারজন নারীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তারা হলেন হজরত মরিয়ম (আ.), হজরত আসিয়া (আ.), হজরত খাদিজা (রা.) ও হজরত ফাতেমা (রা.)। এ ছাড়া ইসলামের ইতিহাসে আরও অসংখ্য নারী ছিলেন যারা জ্ঞানে, গুণে, সততা আর প্রজ্ঞায় এখনো সব নারীর জন্যই অনুপ্রেরণার উৎস।

খাদিজা বিনতে আল খুওয়াইলিদ:

আরবের কোরাইশ বংশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন হজরত খাদিজা (রা.)। তারপরও অত্যন্ত সাধারণ জীবন-যাপন করতেন তিনি। ইসলাম আবির্ভাবের আগে তিনি ইব্রাহিম (আ.)-এর ধর্মে বিশ্বাস করতেন। তৎকালীন সমাজে সৎকর্ম ও দানশীলতার ক্ষেত্রে হজরত খাদিজার সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। বিজ্ঞ ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির খাদিজা ছিলেন হিজাজের অন্যতম বড় ব্যবসায়ী। আধ্যাত্মিকতার প্রতি ঝোঁক ছিল তার। জানা যায়, তিনি

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলেন এবং তিনি আরবের সচেতন ও শিক্ষিত প্রবীণদের কাছে শেষ নবীর নিদর্শন সম্পর্কে মাঝেমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। কিন্তু নবুয়তপ্রাপ্তির আগেই রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে পরিচয় ঘটে খাদিজার। তিনি বুঝতে পারলেন, সমাজের অতুলনীয় ও পবিত্রতম পুরুষ হচ্ছেন মুহাম্মদ (সা.)। রাসুলের গুণাবলি তাকে আকৃষ্ট করে। এরপরই ৪০ বছর বয়সে তিনি ২৫ বছরের রাসুলকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। শুরু হয় তাদের দাম্পত্য জীবন। এই বিয়েকে তৎকালীন সমাজ স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। সম্পদহীন মুহম্মদ (সা.)-কে বিয়ে করায় অনেকেই তাকে তাচ্ছিল্য করতেন। কুরাইশ বংশের এক দল অহংকারী ও নিন্দুক মহিলা তাকে গরিব মুহাম্মদের প্রসঙ্গ টেনে কটাক্ষ করত। তিনি উত্তর দিতেন, 'তার মতো আর কেউ কি আছে? তার মতো সচ্চরিত্রবান ও মর্যাদাবান দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে কি তোমরা চেনো?' ওইসব মহিলার বিদ্বেষমাত্রা এত বেশি ছিল যে, খাদিজার সন্তান প্রসবের সময় বিন্দু পরিমাণ সহযোগিতাও কেউ করেনি।

ইসলাম গ্রহণের পর সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হন। ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার সকল সম্পদ রাসুলকে উপহার দিয়েছিলেন। শোয়াবে আবু তালিব নামক উপত্যকায় মুসলমানরা যখন বিচ্ছিন্ন ও অবরোধের শিকার হয়েছিল, তখন তার আর্থিক সহযোগিতা মুসলমানদের টিকে থাকতে সহায়তা করেছিল। কোনো কারণে রাসুল (সাঃ)-এর মন খারাপ থাকলে তিনি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নিতেন এবং সকল কাজে পরামর্শ দিতেন।

মুসলমানদের ওপর অবরোধ আরোপের পর খাদিজা (রা.) অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। এত সম্পদের মালিক হয়েও তিনি দীর্ঘদিন শুষ্ক এক উপত্যকায় কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করেছেন। ইসলামের জন্য তার অঢেল সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ওই উপত্যকায় কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করার কারণে খাদিজার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর ফলেই তার মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। ইসলামের এই মহীয়সী নারী ৬১৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ রমজান ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

বিবি মরিয়ম (আ.)

বিবি মরিয়ম বাইতুল মুকাদ্দাসের অদূরেই নাছেরা শহরের বাসিন্দা ছিলেন। পিতামাতার ইচ্ছানুযায়ী বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন সুশীলা এবং ধর্মানুরাগী। তার পিতার নাম ছিল ইমরান এবং নবী জাকারিয়া (আ.)-এর শ্যালিকা বিবি হান্না ছিলেন তার জননী।

একদিন মরিয়ম নামাজ পড়ছিলেন, হঠাৎ ফেরেশতা জিব্রাইল অবতীর্ণ হয়ে বললেন, 'তুমি আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তা। আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছেন।'

বিবি মরিয়ম এই অপ্রত্যাশিত সম্বোধনে ভীত হলেন। জিব্রাইল বললেন, 'আমি আল্লাহর ফেরেশতা জিব্রাইল। তুমি ভীত হয়ো না; পবিত্র সন্তান লাভ করবে তুমি, এই সুসংবাদ তোমাকে দিতে এসেছি।'

মরিয়ম বললেন, 'তা কেমন করে, আমি যে কুমারী।'

ফেরেশতা বললেন, 'আল্লাহর কুদরতেই হবে এটি। তার কাছে এটি কঠিন কাজ নয়।'

এই বলে জিব্রাইল উধাও হলেন।

যথাসময়ে বিবি মরিয়ম গর্ভধারণ করলেন। কিন্তু কুমারী নারীর এভাবে গর্ভবতী হওয়ার ফলে সবাই তাকে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের করে দিলেন। এমনকি তাকে স্বগ্রামও ছেড়ে যেতে হলো। বিপদাপন্ন মরিয়ম কোনো আশ্রয় খুঁজে না পেয়ে একটি শহরের দ্বারপ্রান্তে আস্তাবলের একটি পতিত জমিনে এক খেজুর গাছের নিচে আশ্রয় নিলেন এবং সঙ্গী-সহায়হীন অবস্থায় একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। এই পুত্র সন্তানই ছিলেন হযরত ঈসা (আ.)। আট দিন বয়সে সদ্যোজাত ঈসার ত্বক ছেদন করা হয়। মরিয়ম শুচি-স্নাতা হওয়ার পর সন্তান নিয়ে আবারও বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে গেলেন।

এদিকে, মরিয়ম স্বপ্ন দেখলেন, সম্রাট হিরুইস এই সন্তানের শত্রু, সে তাকে হত্যা করতে চায়। সে যেন শিশুকে নিয়ে মিসরে চলে যায়। মরিয়ম তার সন্তান নিয়ে মিসরে রওনা হয়ে যান। হিরুইস যত দিন জীবিত ছিল, ততদিন সন্তান নিয়ে তিনি মিসরেই অবস্থান করেন। হিরুইসের মৃত্যুর পর তিনি নিজ দেশ নাছেরায় ফিরে আসেন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈসার মধ্যে প্রখর জ্ঞান এবং তীক্ষ্ম মেধাশক্তির পরিচয় ফুটে উঠল। আল্লাহর বিশেষ একটি অনুগ্রহ যে তার ওপর রয়েছে, দিন দিন তা প্রকাশ পেতে শুরু করল। ক্রমান্বয়ে হযরত ঈসা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করতে লাগলেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে 'ওহি' লাভ করেন এবং নবীরূপে ধর্মপ্রচার করতে শুরু করেন।

বিবি আসিয়া (আ.)

অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকার জ¦লন্ত প্রমাণ বিবি আসিয়া (আ.)। দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে পদাঘাত করে আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রধান্য দিয়েছেন তিনি।

আসিয়া (আ.)-এর কোলে লালিতপালিত হন আল্লাহর প্রিয় নবী হজরত মুসা (আ.)। শিশু মুসাকে যখন তার মা ফেরাউনের ভয়ে সিন্দুকে ভরে নীল নদে নিক্ষেপ করেন, তা ভাসতে ভাসতে সেই ফেরাউনের ঘাটে গিয়েই ঘুরপাক খেতে থাকে। পাপিষ্ঠ ফেরাউন সিন্দুকটি উঠানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তার অপবিত্র হাতে তা উঠছিল না। কিন্তু বিবি আসিয়া যখন আল্লাহর নামে তা ওঠানোর জন্য হাত দেন, সঙ্গে সঙ্গে তা উঠে আসে। সিন্দুক খুলে একটি পুত্রসন্তান দেখে ফেরাউনের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কারণ ফেরাউন গণকদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল, ইসরাইল বংশে এক শিশুপুত্র জন্ম নেবে,

যার হাতে তার রাজত্ব ধ্বংস হবে। কিন্তু তার স্ত্রী আসিয়া (আ.) শিশুটিকে লালন পালনের আগ্রহ ব্যক্ত করে বলেন, 'এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না।' স্ত্রীর দাবির সামনে ফেরাউন নমনীয় হয়।

আল্লাহ তায়ালা হজরত আসিয়া (আ.)-এর অন্তরে শিশু মুসা (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। তিনি তাকে নিজ ছেলের মতো ভালোবাসতে থাকেন।

হজরত আসিয়া (আ.) ছিলেন মিসরের অধিবাসী মুজাহিমের মেয়ে। তার বাবা তাকে মিসরের ফেরাউন (বাদশাহ) দ্বিতীয় রামসেসের সঙ্গে বিয়ে দেন। ফেরাউন ছিল অত্যন্ত প্রতাপশালী ও কুখ্যাত। নিজেকে তিনি খোদা বলে দাবি করতেন। কিন্তু আসিয়া (আ.) ফেরাউনের ভ্রান্ত দাবি, বিশ্বাস ও স্বৈরাচার নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেন। এতে ফেরাউন তার ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়। আসিয়ার ওপর নেমে আসে জুলুম-নির্যাতন। ফেরাউনের নির্দেশে তাকে জিঞ্জিরে বেঁধে রাখা হয়, বিরাট পাথরের নিচে তাকে চাপা দিয়ে রাখা হয়। পাথরের আঘাতে তার পবিত্র দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়। এমনকি তার চোখও উপড়ে ফেলা হয়। কিন্তু এসব অমানবিক নির্যাতনেও আসিয়ার বিশ্বাসকে চুল পরিমাণ টলানো সম্ভব হয়নি।

ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ:

ইসলামের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তার প্রথম স্ত্রী খাদিজার মেয়ে ছিলেন ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ। সারা বিশ্বের মুসলমানরা তাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। মক্কায় কোরাইশদের দ্বারা মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর নির্যাতন ও দুর্দশার সময়ে সব সময়ই ফাতেমা তার পাশে ছিলেন। ফাতেমা মহানবী (সা.)-এর মেয়ে হয়েও স্নেহময়ী মায়ের মতো মহানবীকে ভালোবাসতেন বলেই তার উপাধি হয়েছিল 'উম্মে আবিহা'। এর অর্থ 'তার পিতার মা'। মহান আল্লাহর নির্দেশে হিজরতের সময় হজরত ফাতেমাও নবী পরিবারের অন্যদের সঙ্গে হিজরত করেন। তিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদিনের চতুর্থ খলিফা ইসলামের বীর সৈনিক হজরত আলী (রা.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী এবং ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম শহীদ হজরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনের মা।

ফাতেমা (রা.)-এর মা খাদিজা (রা.) মারা যাওয়ার সময় প্রচুর ধন-সম্পদ রেখে যান। মহীয়সী মায়ের মতো তিনিও সকল ধন-সম্পদ ইসলাম প্রচারের জন্য তার বাবার হাতে তুলে দেন। বদান্যতা, মহানুভবতা ও দরিদ্রদের প্রতি তার মমতা এতই বেশি ছিল যে, কোনো অসহায় বা ভিক্ষুক কখনোই কিছু না পেয়ে তার ঘরের দরজা থেকে খালি হাতে ফিরে যায়নি।

প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর চরিত্রের প্রতিটি গুণই তার জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। তিনি ছিলেন সত্যের পূজারী, আমানতদারী, লাজুক, নম্র ও সরলমনা। শৈশব থেকেই হজরত ফাতেমা ছিলেন নির্ভীক, তেজস্বিনী ও বক্তা। তিনি সর্বদা তার বাবা হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শ অনুসরণ করতেন এবং মা বিবি খাজিদা (রা.)-এর আদেশ ও উপদেশাবলি বাস্তব জীবনে পালন করতেন। তার জন্ম সম্পর্কে নানা মতভেদ রয়েছে। তিনি ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে

মতান্তরে ৬০৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বলা হয়ে থাকে, প্রথম কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পাঁচ বছর পর কাবাঘর সংস্কারের সময় জন্মগ্রহণ করেন। হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং মদিনার জান্নাতুল বাকিতে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। হজরত ফাতেমার মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, 'দুনিয়ার সব নারীর ওপর চারজন নারীর মর্যাদা রয়েছে। তারা হলেন হজরত মরিয়ম (আ.), হজরত আসিয়া (আ.), হজরত খাদিজা (রা.) ও হজরত ফাতিমা (রা.)। পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে হজরত ফাতেমার (রা.) মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ফাতিমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার অটুট ছিল, এমনকি চ্যালেঞ্জের মুখেও। আলী ইবনে আবু তালিবের সাথে তার বিবাহ, নবীর ঘনিষ্ঠ সহচরদের একজন, এবং তাদের সন্তানদের মা হিসেবে তার ভূমিকা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তার প্রভাবকে আরও দৃঢ় করেছে।

জয়নাব বিনতে আলী:

ফাতিমা এবং আলীর কন্যা জয়নব ইসলামের ইতিহাসে অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে বেঁচে ছিলেন। তিনি কারবালার যুদ্ধ এবং পরবর্তী ঘটনার সময় তার পরিবার এবং ধর্মের প্রতি অসীম সাহসিকতা এবং অঙ্গীকার প্রদর্শন করেছিলেন।

তার প্রিয়জনদের মর্মান্তিক মৃত্যু প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও, জয়নব তার বিশ্বাসের প্রতি অবিচল এবং সত্য ছিলেন। তার দৃঢ়তা এবং সাহস মুসলমানদের, বিশেষ করে নারীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করে।

হাফসা বিনতে উমর:

হাফসা ছিলেন ইসলামিক জ্ঞান সংরক্ষণের জন্য তিনি সম্মানিত। তিনি কিন্তু রাসুলের স্ত্রীও ছিলেন। বিধবা হওয়ার পর, উসমান ও আবু বকর তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেন। পশুর চামড়া ও হাড়ের ওপর লিখিত কোরআনের প্রথম পান্ডুলিপি হজরত ওমরের (রা.) কন্যা হাফসার (রা.) কাছে সংরক্ষিত ছিল। ইসলামি খেলাফতের অধীন বিভিন্ন প্রদেশে কোরআনের ছয়টি অপ্রামাণ্য সংকলন প্রচলিত ছিল। হজরত হাফসার (রা.) কাছে কোরআনের প্রামাণ্য পান্ডুলিপি সংরক্ষিত থাকায় খলিফা উসমানের (রা.) পক্ষে অপ্রামাণ্য সংস্করণগুলো ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে হাফসার (রা.) যোগ্যতা ও নৈতিক অবস্থান কতটা নির্ভরযোগ্য ছিল তা অনুমান করা যায়। তিনি তার ব্যতিক্রমী কুরআন মুখস্থ করার জন্য পরিচিত হন , যা তখন প্রাথমিকভাবে মৌখিকভাবে প্রেরণ করা হয়েছিল। কুরআন সংরক্ষণের প্রতি তার নিবেদন অনেককে অনুপ্রাণিত করেছিল, বিশেষ করে মহিলাদের, পবিত্র পাঠ্য পড়তে এবং মুখস্থ করতে ।

আয়েশা বিনতে আবু বকর:

আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.) ছিলেন নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্ত্রী। নবীজির খুব প্রিয় স্ত্রী ছিলেন আয়েশা। মুসলিম সম্প্রদায় তাকে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর স্ত্রী হিসেবে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করে থাকেন। ইসলামের ঐতিহ্য অনুসারে, তাকে 'উম্মুল মুমিনিন' বা 'বিশ্বাসীদের মাতা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ ছাড়া ইসলামের ঐতিহ্যগত ইতিহাসেও তার অবদান অনস্বীকার্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানে হজরত আয়েশা (রা.) ছিলেন নজিরবিহীন। কোরআন-হাদিসের জ্ঞান এবং ইসলামি শরিয়তের মাসলা-মাসায়েলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।আবু বকরের কন্যা আয়েশা নবী মুহাম্মদের বাণী ও কর্ম বর্ণনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি 2,000 টিরও বেশি হাদিস নথিভুক্ত করেছেন, ইসলামী শিক্ষা এবং বৃত্তিতে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবি কাব্য সম্পর্কে তার অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে ছয় বছর বয়সে মতান্তরে নয় বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। নবীজির স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ছোট বয়সের। মৃত্যুর সময় মুহাম্মদ (সা.) তার ঘরেই ছিলেন এবং তার এই প্রিয়তমা স্ত্রীর বাহুযুগলে মাথা রেখেই মহানবী (সা.) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর জনগণ আবু বকর (রা.)-কে খলিফা নির্বাচন করেন। তখন আয়েশা (রা.) নবী (সা.)-এর স্ত্রী এবং খলিফার মেয়ে হিসেবে সমধিক সম্মান পেতেন। আবু বকর (রা.) তার মৃত্যুর আগে ওমর (রা.)-কে খলিফা নিযুক্ত করে যান। খলিফা ওমর (রা.)-এর শাসনামলেও তিনি দাপটের সঙ্গে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহে মতামত প্রদান করার স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে বসরার যুদ্ধ বা উটের যুদ্ধ নামে পরিচিত যুদ্ধে তিনি পেছন থেকে নেতৃত্ব দেন। ইতিহাসে এ যুদ্ধের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। তিনিই ছিলেন একমাত্র নারী যিনি সামনে থাকা অবস্থায় হজরত মুহাম্মদ (সা.) কাছে ওহি অবতীর্ণ হয়েছিল। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) ছিলেন তার বাবা। আয়েশা (রা.) ৬১৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মতান্তরে ৬১৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। রোগে আক্রান্ত হয়ে ৫৮ হিজরি সনের ১৭ রমজান (১৬ জুলাই, ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন। তাকে দাফন করা হয় জান্নাতুল বাকিতে। তার মাতার নাম উম্মে রুমান।

আয়েশার জ্ঞান এবং দক্ষতা জীবনের বিভিন্ন দিককে বিস্তৃত করে, তাকে একজন সম্মানিত শিক্ষক এবং পণ্ডিত করে তোলে। তিনি মুসলিম নারীদের জন্য রোল মডেল হিসেবে কাজ করেন যারা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে চায়।

রাবেয়া বসরী (রহ.)

ইরাকের বসরা নগরীতে এক দরিদ্র পল্লীতে জন্ম হয়েছিল হজরত রাবেয়া বসরীর (রহ.)। দরিদ্র হলেও তার পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্মানিত। বাবার নাম ইসমাঈল ও মায়ের নাম মায়ফুল। প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারিণী ছিলেন তিনি। সব সময় গভীর চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। তার জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে বলা হয় ৭১৯ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কথিত আছে, তার বাবা এতই দরিদ্র হয়ে পড়েছিলেন, যে রাতে রাবেয়া বসরী (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন, তখন ঘরে বাতি জ্বালাবার তেল এবং প্রসূতি ও সন্তানের পেটে মালিশ করার তেল পর্যন্ত ছিল না। রাবেয়ার আগে তার বাবার আরও তিনটি মেয়ে হয়েছিল। তিনি চতুর্থ নম্বর বলে তার নাম রাবেয়া রাখা হয়। আরবি ভাষায় রাবেয়া শব্দের অর্থ চতুর্থা। রাবেয়া বসরী (রহ.) মা-বাবার কাছ থেকে কোরআন, হাদিস ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি কখনো কারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। সব সময় তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করতেন। তিনি একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করে সেখানে নীরবে দিন-রাত ইবাদতে রত থাকতেন। আল্লাহর একজন প্রকৃত ওলি হওয়ার জন্য যা যা গুণাবলি থাকা প্রয়োজন সকল গুণের অধিকারিণী ছিলেন হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)। সে সময় স্বনামধন্য অনেক সুফি রাবেয়া বসরীর (রহ.) কাছে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করার জন্য আসতেন। রাবেয়া বসরী দাসত্বের জীবনও অতিবাহিত করেছেন। বিরামহীন ভাবে সারা দিন কাজ করে আল্লার ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন। রাবেয়া বসরীর উদ্দেশ্যই ছিল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা। রাবেয়া বসরীর ইবাদত-বন্দেগি দেখে তার মনিব তাকে দাসত্ব জীবন থেকে মুক্ত করেন।

একবার মুনাজাতের সময় তিনি বলছিলেন ‘হে আল্লাহ। যদি জান্নাতের লোভে ইবাদত করি তাহলে আমি যেন কখনোই জান্নাতে না যাই আর যদি জাহান্নামের ভয়ে ইবাদত করি তাহলে যেন আমি জাহান্নামে যাই। কিন্তু আল্লাহ আমি যদি শুধু তোমাকে ভালোবেসে তোমার ইবাদত করি তাহলে আমি যেন কখনোই তোমার দর্শন থেকে এক মুহূর্ত বঞ্চিত না হই।’ এই মহীয়সী নারী ৮০১ খ্রিস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আরও যারা

যুবায়দা (রা.) : ১৮৬ হিজরিতে খলিফা হারুনুর রশীদের স্ত্রী বিবি যুবায়দা হজ পালনকালে মক্কায় হাজিদের পানির কষ্ট দেখতে পান। তখন তিনি পাহাড়ের জলপ্রপাত থেকে মক্কা শহর পর্যন্ত খাল কাটার নির্দেশ দেন। তার একক প্রচেষ্টায় ও ব্যক্তিগত খরচে প্রায় সাড়ে ষোল কিলোমিটার লম্বা খাল খনন করা হয় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন পয়েন্টে হাজি ও মুসাফিরদের পানির যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা হয়। বলা হয়ে থাকে, মক্কা থেকে তায়েফমুখী এই খাল খননকার্যে বিবি যুবায়দা আনুমানিক ৫৯৫০ কিলোগ্রাম স্বর্ণ খরচ করেছিলেন।

ইতিহাসে এটি 'উয়ুন যুবায়দা' বা 'বিরকাতে যুবায়দা' হিসেবে প্রসিদ্ধ এবং ১২০০ বছর পরও এখান থেকে সেচপ্রকল্প অব্যাহত আছে।

এছাড়াও ইসলামের ইতিহাসে জানা যায়, হুদায়বিয়ার সংকটে হজরত মুহাম্মদ (সা.) উম্মে সালমার (রা.) পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন।

অষ্টম শতাব্দীর স্কলার ফাতেমা আল বাতায়াহিয়্যাহ দামেস্কে সহিহ বুখারির দরস দিতেন। তৎকালীন তিনি সবচেয়ে বড় মাপের স্কলারদের একজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

দ্বাদশ শতকে আরেকজন স্কলার ছিলেন জয়নব বিনতে কামাল। তিনি চার শতাধিক হাদিসের কিতাব পড়াতেন।

ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ আল সমরকন্দির কথা বলা যায়। তিনি ছিলেন একজন ফিকাহবিদ। কীভাবে ফতোয়া ইস্যু করতে হয়, সে বিষয়ে তিনি তার অধিকতর বিখ্যাত স্বামীকে পরামর্শ দিতেন।

যেসব নারী সাহাবি কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, হজরত খানসা, সওদা বিনতে কোরায়য (হযরত উসমান (রা.)-এর খালা), হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দুধবোন শায়মা, আতেকা বিনতে যায়দ ও অন্যান্য।

হজরত খানসা (রা.)-এর কবিতা নবীজি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে শুনতেন, আর হাতে ইশারা করে বলতেন, হে খানসা, আরও কিছু শোনাও।

কারিমাহ আল মারওয়াযিয়্যাহ ছিলেন অনেক উচ্চস্তরের হাদিস বিশারদ। এছাড়াও ইমাম বুখারি প্রায় ৮০ জন নারী হাদিস বিশারদের কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামে নারীর অধিকার

ইসলামে নারীর অধিকার একটি ঘন ঘন আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়। ইসলাম নারীদের বিভিন্ন অধিকার ও সুরক্ষা প্রদান করে, সমাজে তাদের মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করে। আসুন ইসলামে নারীর অধিকারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক পরীক্ষা করা যাক:

প্রাক-ইসলামিক যুগে কন্যাসন্তানদের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। কন্যাসন্তানদের পিতা হওয়াকে অপমানজনক মনে করা হতো। কারো কন্যাসন্তান জন্ম নিলে সে খুবই মর্মাহত হতো; এমনকি কেউ কেউ তাকে হত্যাও করে ফেলত। এ অবস্থায় আরবের বর্বরতার অন্ধকার যুগের নারীদের প্রতি অমানবিক নির্যাতন নিষিদ্ধ করে ইসলাম যে প্রয়োজনীয় বিষয়ে নারীদের ন্যায়সংগত অধিকার প্রদান করেছে তা নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো—

শিক্ষাগত অধিকার

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষাকে উৎসাহিত করে। নবী মুহাম্মদ বলেছেন,

"জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।"

এই হাদিস উভয় লিঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য জ্ঞানের অন্বেষণকে উৎসাহিত করে। ইসলাম ধর্মে জ্ঞানার্জনকে অতীব গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

কোরআন শরিফের সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে কোরআন শরিফ অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। পড়া অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করার নির্দেশনা দিয়ে ইসলামের শুভ সূচনা। জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে কোরআন শরিফে আরো বলা হয়েছে, 'যারা জানে (জ্ঞানী) আর যারা জানে না (জ্ঞানী নয়) তারা কি সমান?' (সুরা জুমার, আয়াত : ৯) মুসলমানদের জ্ঞানার্জন করার জন্য হাদিসে শুধু খুব উৎসাহই প্রদান করা নয়, অবশ্য কর্তব্য বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।

' (ইবনে মাজাহ)

অর্থাৎ পুরুষের যেমন শিক্ষার অধিকার আছে, তেমনি নারীরও শিক্ষার অধিকার আছে, যা উভয়ের জন্য অবশ্যই পালনীয়।

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলাম নারীদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা ও পরিচালনার অধিকার দিয়েছে। কুরআনের সূরা আন-নিসা (4:32) এ বলা হয়েছে,

"আর তোমরা এমন কিছু কামনা করো না, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের একে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য তারা যা উপার্জন করেছে তার একটি অংশ এবং মহিলাদের জন্য তারা যা অর্জন করেছে তার একটি অংশ।

এই আয়াতটি নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের উপর জোর দেয় যা তারা অর্জন করেছে এবং নারীর সম্পত্তির মালিকানার অধিকারকে বোঝায়।

ইসলামে পরিবার-পরিজন চালানোর জন্য, ভরণ-পোষণের জন্য নারীর অর্থ-উপার্জনের প্রয়োজন নেই, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নারীরা যদি অর্থ উপার্জন করে তাহলে তা তাদের নিজস্ব সম্পদ বলে পরিগণিত হয়। এ সম্পদসহ অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের কর্তৃত্ব শুধু তাদেরই থাকে।

তারা তাদের ধন-সম্পদ ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারে। কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'পুরুষরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ, আর নারীরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ।' (সুরা নিসা, আয়াত : ৩২)

কোরআন ও হাদিসে কোথাও নারীর কাজ করার বাধা-বিপত্তি আরোপ করা হয়নি। তবে শর্ত হলো, এ কাজ শরিয়তের সীমার মধ্যে হতে হবে। অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ ইসলাম দিয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) নারীদের উদ্দেশে বলেছেন, 'আল্লাহ প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন।' (বুখারি)

এ জন্য দেখা যায়, তৎকালে মুসলিম নারীরা অবস্থাভেদে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, শিল্প ও কারুকর্মে অংশগ্রহণ করতেন।

ইসলাম নারীদের পিতা-মাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের অধিকার প্রদান করেছে। এ ব্যপারে কোরআন শরিফে একাধিক আয়াতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কোরআন শরিফের সুরা বাকারা, সুরা নিসা, সুরা মায়েদায় বলা হয়েছে যে নারীরা স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, কন্যা হিসেবে, বোন হিসেবে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী হবে। এ ছাড়া ইসলামে নারীদের বিয়েতে মোহরানার (দেনমোহর) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা সম্পদ লাভ করে। এ সম্পদের ওপর একচ্ছত্রভাবে অধিকার শুধু নারীরই আছে।

ইসলামে নারীর পরকালীন কল্যাণের অধিকার

পরকালীন কল্যাণেও পুরুষদের মতো নারীদের অধিকার আছে। কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'আর যে সৎকাজ করবে সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে ঈমানদার হয় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর কারো ওপর বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১২৪)

এ ব্যাপারে কোরআন শরিফের আরেকটি সুরা নাহলে বলা হয়েছে, 'পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, যদি সে মুমিন হয় তাহলে তাকে আমি দুনিয়াতে পবিত্র জীবন যাপন করাব এবং পরকালের জীবনেও এদের সৎকর্মের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার দেব।' (সুরা নাহল, আয়াত : ৯৭)

এ দুটি আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, জান্নাত লাভের জন্য তথা পরকালের কল্যাণ লাভের জন্য নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার।

কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার

ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের পূর্বে আরবরা নিজেদের সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করত। ইসলাম সন্তান হত্যা হারাম ঘোষণা করে পুত্র-কন্যাদের এ থেকে সুরক্ষা প্রদান করেছে। কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না; তাদের এবং তোমাদেরও আমি রিজিক (আহার) প্রদান করি। তাদের হত্যা করা মহাপাপ।' (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩১)

ইসলামে পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানের মধ্যে মর্যাদাগত কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামে কন্যাসন্তানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাকেও নিষেধ করেছে। মুহাম্মদ (সা.) আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার কন্যাসন্তানের কারণে কোনোরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হয় (বিপদগ্রস্ত হয়) সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করলে তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে আবরণ (প্রতিবন্ধক) হবে।' (তিরমিজি)

স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার

ইসলামে স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা স্বামীর অনুরূপ। কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর ন্যায়সংগত অধিকার আছে, তেমনি স্ত্রীদেরও অধিকার আছে পুরুষদের ওপর।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৮)

স্ত্রী হিসেবে শুধু ন্যায়সংগত অধিকারই নয়, সম্মানজনক আচরণ ও উত্তম ব্যবহারও নারীর প্রাপ্য। এ ব্যাপারে কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে জীবনযাপন করবে। এমনকি যদি তাদের অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন জিনিসকে অপছন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ অশেষ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১৯)

মাতা হিসেবে নারীর অধিকার

কোরআন শরিফে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন, 'আর ইবাদত করো আল্লাহর, শরিক করো না তার সঙ্গে অন্য কাউকে, আর পিতা-মাতার সঙ্গে সৎ ও সদয় ব্যবহার কোরো।' (সুরা নিসা, আয়াত : ৩৬)

ইসলামবিরোধী পিতা-মাতার ব্যাপারেও সন্তানের দায়িত্ব সম্বন্ধে কোরআন শরিফে আল্লাহ পাক বলেন, 'যদি তারা (পিতা-মাতা) উভয়ে তোমাকে ওই বিষয়ের ওপর পীড়াপীড়ি করে যে তুমি আমার সঙ্গে শিরক করবে, যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞানই নেই, তাহলে তুমি তাদের

দুজনের (কারোরই) কথা মানবে না, তবে দুনিয়ার জীবনে তুমি অবশ্যই তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।' (সুরা লোকমান, আয়াত : ১৫)

নারীর পছন্দমতো বিয়ের অধিকার

ইসলামিক শিক্ষা বিবাহের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতির উপর অত্যন্ত জোর দেয়। নবী মুহাম্মদের মতে,

"একজন মহিলাকে অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করা যায় না, এবং সাক্ষী ছাড়া বিবাহ অবৈধ।"

এই হাদিসটি একজন মহিলার সম্মতির গুরুত্ব এবং বিবাহ চুক্তির যথাযথ ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

ইসলাম নারীকে তার পছন্দমতো বিয়ে করার অধিকার দিয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) এ হাদিস বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোনো বিধবা নারীকে তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না। (সাহাবি) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তার অনুমতি কিভাবে নেব? তখন তিনি বললেন, জিজ্ঞেস করার পর নীরব থাকাই তার অনুমতি।' (বুখারি)

আর কুমারী নারীর বিয়ের ব্যাপারে আয়েশা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, একটি কুমারী নারী তো লজ্জাবোধ করে। তিনি বলেন, চুপ থাকাই তার অনুমতি।' (বুখারি)

নারীর অপবাদ থেকে সুরক্ষার অধিকার

বর্তমান সমাজে দেখা যায়, একশ্রেণির পুরুষ হীনস্বার্থে ভদ্র পরিবারের নারীর ওপর অপবাদ আরোপ করছে; সংশ্লিষ্ট নারীর ছবি অন্য খারাপ নারীর ছবির সঙ্গে সম্পাদন (Edit) করে অশ্লীল ছবিতে রূপান্তরিত করে জঘন্য কুৎসা রটনা করে প্রচারমাধ্যম ইউটিউব, ফেসবুকে দিচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট সতী-সাধ্বী নারী ও তার পরিবার-পরিজনকে অসহনীয় অবস্থায় পড়তে হচ্ছে। এ রকম অপবাদ থেকে নারীর সুরক্ষা পাওয়ার জন্য কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'যারা সতী-সাধ্বী নারীর ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে এবং এর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাদের ৮০টি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।' (সুরা নুর, আয়াত : ৪)

পরিশেষে মানবসভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, ইসলামই ১৪০০ বছর আগে নারী জাতিকে প্রকৃত মর্যাদা ও ন্যায়সংগত অধিকার প্রদান করেছে। এ জন্যই প্রখ্যাত অমুসলিম মনীষী পিয়েরে ক্রাবাইট (Pierre Crabite) ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা (আল্লাহ পাক থেকে প্রাপ্ত ইসলাম ধর্মের প্রচারক) মুহাম্মদ (সা.) সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন যে

'Muhammad was the world's greatest Champion of women's rights the world has ever seen.' [মুহাম্মদ (সা.) হলেন নারী অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যা পৃথিবীতে আর কখনো দেখা যায়নি]

সমান আধ্যাত্মিক অবস্থা:

কুরআন সুস্পষ্টভাবে বলে যে আল্লাহর দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সমান। সূরা আল-হুজুরাত (৪৯:১৩) এ বলা হয়েছে,

"হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক।"

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে জোর দেয় যে ধার্মিকতা শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, লিঙ্গ নয়।

উত্তরাধিকারের অধিকার:

ইসলামে, মহিলাদের উত্তরাধিকারের অধিকার দেওয়া হয়েছে, তারা যাতে ন্যায্য অংশ পায় তা নিশ্চিত করে। কোরান উত্তরাধিকার বণ্টনের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করে, যেখানে নারীদের মৃত ব্যক্তির সাথে তাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি অংশ বরাদ্দ করা হয়।

এটি নিশ্চিত করে যে মহিলারা একটি বাধ্যতামূলক অংশ পাবেন, পরিমাণ নির্বিশেষে। সূরা আন-নিসার (4:7) আয়াতটি স্পষ্টভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে উত্তরাধিকার বিভাজনের কথা বলে, এই বিষয়ে ন্যায্যতার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়।

বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার:

ইসলাম নারীদেরকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তালাক চাওয়ার অধিকারও দিয়েছে। ইসলামে বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়ার লক্ষ্য তালাকপ্রাপ্ত নারীদের অসুখী বা অপমানজনক বিবাহে আটকা পড়া থেকে রক্ষা করা। কুরআন বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলাকালীন মহিলাদের প্রতি ন্যায্য আচরণ এবং দয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

সূরা আল-বাকারাহ (2:229) বলে যে তালাক দুইবার হতে পারে, এবং তার পরে, স্বামীকে অবশ্যই তার স্ত্রীকে গ্রহণযোগ্যভাবে রাখতে হবে বা ভাল ব্যবহার করে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। এই শ্লোকটি বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলাকালীন মহিলাদের সম্মান ও সহানুভূতির সাথে আচরণ করার গুরুত্ব তুলে ধরে।

আর্থিক সহায়তার অধিকার:

স্ত্রী হিসেবে একজন নারী তার স্বামীর কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার অধিকারী। কুরআনের সূরা আন-নিসা (৪:৩৪) এ বলা হয়েছে ,

"পুরুষরা নারীদের দায়িত্বে রয়েছে [অধিকারে] যা আল্লাহ একে অপরের উপর দিয়েছেন এবং তারা তাদের সম্পদ থেকে যা ব্যয় করে।

এই আয়াতটি তাদের স্ত্রীদের আর্থিক চাহিদা মেটাতে পুরুষদের দায়িত্ব তুলে ধরে।

মানবসভ্যতার বিকাশে নারীর ভূমিকাঃ

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।’ (সুরা: হুজরাত, আয়াত: ১৩)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ‘পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যে ঈমানের সঙ্গে ভালো কাজ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণ অবিচার করা হবে না।’ (সুরা: নিসা, আয়াত: ১২৪)

উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনে সূরা নিসায় বলা হয়েছে,

> “ "তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে এই বিধান দিচ্ছেন: পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান হবে। যদি দুই জনের বেশি নারী হয়, তাহলে সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দেয়া হবে। আর একজন নারী হলে মোট সম্পদের অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে, তাঁর পিতা-মাতা প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে। আর সে যদি নিঃসন্তান হয়, পিতা-মাতাই হয় উত্তরাধিকারী, তাহলে মাকে দেয়া হবে তিন ভাগের একভাগ। মৃতের ভাই বোন থাকলে মা সেই ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। এসব বণ্টন মৃতের কোনো অসীয়ত থাকলে, তা এবং ঋণ থাকলে তা আদায় করার পরে। তোমাদের পিতা-মাতা এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততী, তোমাদের জানা নাই এঁদের মধ্যে তোমাদের কল্যাণের দিক দিয়ে কারা ঘনিষ্টতর। এই বণ্টন ব্যবস্থা ফরজ করে দেয়া হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তো সব কিছুর ব্যাপারেই পূর্ণ অবহিত এবং তিনিই হচ্ছেন বিজ্ঞ, পরম কুশলী। আর তোমাদের স্ত্রীরা যা কিছু রেখে গেছে, তার অর্ধেক তোমরা পাবে যদি তাঁরা নিঃসন্তান হয়। সন্তান থাকলে তোমরা পাবে ত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের একভাগ। তাঁদের করে যাওয়া অসীয়ত এবং দেনা থাকলে, তা সব আদায়ের পর। আর তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদের তাঁরা পাবে চারভাগের একভাগ, যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। সন্তান থাকলে তাঁরা পাবে আট ভাগের একভাগ। তাও কার্যকর হবে তোমাদের কোনো অসীয়ত এবং দেনা থাকলে তা আদায়ের পর। আর যদি এমন কোনো পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক, যাঁর না আছে কোনো সন্তান, আর না আছে পিতা-মাতা। আছে এক ভাই অথবা এক বোন তাহলে তাঁদের প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। আর ভাই বোন যদি দুই এর বেশি হয়, তাহলে তাঁরা সবাই মিলে মোট সম্পদের তিন ভাগের একভাগ ”

পাবে। তাও কোনো অসীয়ত এবং ঋণ থাকলে তা আদায়ের পর। কোনোভাবেই কারো কোনো ক্ষতি করা বা হতে দেয়া যাবে না। (এসব কিছু) আল্লাহর দেয়া উপদেশমালা। আর আল্লাহ সব কিছুর ব্যাপারেই পূর্ণ অবহিত এবং পরম ধৈর্য্যশীল।"৪:১১-১২

এবং

> “ "তাঁরা আপনার কাছে ফতোয়া জানতে চায়। বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন, নিঃসন্তান ও পিতৃ-মাতৃহীন মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে। যদি এমন ব্যক্তি মারা যায়, যাঁর কোনো সন্তান নেই, আছে এক বোন। তাহলে সে পাবে সম্পদের অর্ধেক আর যদি বোন মারা যায় তাহলে ভাই পুরো সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুই বোন হয়, তাহলে ত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ তাঁরা পাবে। আর যদি কয়েকজন ভাই-বোন হয়, তাহলে পুরুষেরা পাবে দুই ভাগ, আর নারীরা পাবে এক ভাগ। আল্লাহ স্পষ্ট করে দিচ্ছেন তোমাদের জন্য যেন তোমরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে না যাও। প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কেই আল্লাহ পূর্ণ অবহিত।"৪:১৭৬ ”

আয়াতত্রয়ীর বর্ণনা মতে, ত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টনের বেলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ দুজনেই সমান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী এগিয়ে। তবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ এগিয়ে।

সাক্ষী

মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনে সূরা বাক্কারায় বলা হয়েছে,

> “ "হে ঈমানদারগণ, যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা একে অপরের সাথে লেনদেন কর, তাহলে তা লিখে নিয়ো। অতঃপর তোমাদের নিজেদের মধ্যের দুজন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। তখন যদি দুজন পুরুষের আয়োজন না করা যায়, তাহলে একজন পুরুষ এবং যাঁদের সাক্ষীর ব্যাপারে তোমরা আস্থাশীল এমন দুজন নারী বেছে নাও। যেন, একজন ভুল করলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।"২৮২ ”

ইসলামী সমাজে নারী এবং পুরুষের প্রকৃতি এবং ভূমিকার পার্থক্যের ভিত্তিতে সাক্ষী দানের ক্ষেত্রে আলাদা মানদন্ড নির্ধারণ করেছে। লিঙ্গ বৈষম্য এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়।
মুসলমানদের কাছে তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনের পরই নির্দেশনার জন্য মূল্যবান যে উৎস, তা হচ্ছে হাদিসগ্রন্থ।

> “ "আবূ সা‘ঈদ খুদরী সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীদের সাক্ষ্য কি পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? উপস্থিতরা বলল, অবশ্যই অর্ধেক। তিনি বলেন, এটা নারীদের জ্ঞানের ক্রুটির কারণেই। (৩০৪)" (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৪৬৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৪৮২) ”

হযরত আবু হুরায়রা সর্বাধিক ৫৩৭৪ টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তার বর্ণিত হাদিস সমূহ শুধু তার একক স্বাক্ষীর ওপরেই বিশুদ্ধতার সকল বিবেচনায় উত্তীর্ণ। আবার হাদিসগ্রন্থ সমূহের মধ্যে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০ টি। যা সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। তিনি একজন নারী। আর তার বর্ণিত হাদিস সমূহও শুধু তার একক সাক্ষ্যের ওপরেই বিশুদ্ধতার সকল বিবেচনায় উত্তীর্ণ।এক্ষেত্রে নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। ঘটনার প্রকৃতি ও ভূমিকা ঠিক থাকলে, ইসলামে একজন নারী সাক্ষীই যথেষ্ট। ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদেরা অনেকেই এ ব্যাপারে একমত [যে চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন বিশ্বাসী নারীর সাক্ষীই যথেষ্ট। তবে, ঘটনার প্রকৃতি এবং ভূমিকা বদলে গেলে সাক্ষীর ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। সাধারণত ইসলাম পর্দার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তাই ইসলাম নারীদের ওপর কোনো অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা বা দায়দায়িত্ব আরোপ করেনি। যেসব ক্ষেত্রে ঘটনার প্রকৃতি আর্থিক এর মত (ইসলামী মতে যা অধিক পুরুষ সংশ্লিষ্ট) সেসব ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় পুরুষ সাক্ষীর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।]

বিবাহ

ইসলাম ধর্ম অনুসারে কোন নারী এক সাথে একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না। তবে, একজন পুরুষ একাধিক (সর্বোচ্চ চারজন) নারীর সাথে বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে।তবে, পুরুষদের মতই একজন নারী তার পছন্দের সৎপুরুষের কাছে নিজেকে বিয়ের জন্য পেশ করতে পারবে। কোনো অভিভাবক বা পুরুষ কোনো বিধবা অথবা কুমারী মহিলাকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করতে বা দিতে পারবে না। এমনকি নারীর অনুমতি ব্যতীত অভিভাবক তাকে বিয়ে দিলে তা বাতিল করা যাবে। এ সম্পর্কে হযরত খানসা বিনতে খিযাম আল আনসারিয়া থেকে বর্ণিত,

> “ "যখন তিনি বয়স্কা ছিলেন তখন তাঁর পিতা তাঁকে বিয়ে দেন। এ বিয়ে তাঁর পছন্দ ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ এর কাছে গেলে তিনি তা বাতিল করে দেন।"৪৭৬৬

আধুনিক যুগে তাফসিরশাস্ত্রে নারীদের অবদান

তাফসির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। এটি সরাসরি কোরআনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইসলামী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নারীর পদচারণ থাকলেও প্রাচীন যুগ থেকে এই শাস্ত্রে নারীদের উপস্থিতি কম দেখা যায়। নিম্নে আধুনিক যুগে তাফসিরশাস্ত্রে নারীদের অবদান তুলে ধরা হলো।

তাফসিরশাস্ত্রের আধুনিক যুগ : ১৪ শ হিজরির সূচনা বা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে আধুনিক যুগ শুরু বোঝায়। মুহাম্মদ আবদুহুর হাত ধরেই এই যুগের সূচনা হয়েছিল। তিনিই তাফসিরশাস্ত্রে নবত্ব আনেন।

আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য : আধুনিক যুগের তাফসিরশাস্ত্রের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তা হলো—

এক. বিষয়ভিত্তিক তাফসির : এই যুগে বহু তাফসিরবিদ নির্দিষ্ট সুরাকে কেন্দ্র করে তাফসির পেশ করেছেন। বা একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে ওই বিষয়সংশ্লিষ্ট সব আয়াত একত্র করে তাসফির করেছেন।

দুই. মৌখিক তাফসির : এই যুগে বিভিন্ন মিডিয়া, টিভি শো বা রেডিওতে তাফসির অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তিন. নারীদের অংশগ্রহণ : এই যুগে তাফসির জগতে নারীদের অংশগ্রহণ দেখা যায়। তাঁদের অনেকে পূর্ণাঙ্গ কোরআনের তাফসির করেন, অনেকে সুরাবিশেষের তাসফির করেন। (জুহুদুল মারআ আল মুআসিরা ফি তাফসিরিল কুরআনিল কারিম, পৃষ্ঠা ৯)

আধুনিক যুগের কয়েকজন মুফাসসির : আধুনিক যুগের কয়েকজন নারী মুফাসসির হলেন—

আয়েশা আবদুর রহমান : তিনি মিসরের দিময়াত শহরে ১৯১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নানা ছিলেন আল আজহারের শিক্ষক। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শেষ করেন আয়েশা আবদুর রহমান। ১৯৫০ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তাফসিরশাস্ত্রে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। রচনা করেন বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ। বলা যায়, তিনি আধুনিক যুগের প্রথম সারির নারী তাফসিরবিদ ও ইসলামী নারী স্কলার। তাঁর উল্লেখযোগ্য তাফসিরগ্রন্থ হলো দুই খণ্ডের 'আত তাফসিরুল বায়নি লিল কুরআনিল কারিম'। এটি ৩০তম পারার বিশেষ কিছু সুরার তাফসির। এ ছাড়া তাসফির ও কোরআনি সায়েন্স বিষয়ে তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন।

জয়নব বিনতে মুহাম্মদ গাজালি : ১৯১৮ সালে মিসরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন আল আজহারের শিক্ষক। শৈশবেই তিনি তাঁর পিতাকে হারান। মায়ের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। তিনি তাফসির, ফিকহ, হাদিসসহ অন্যান্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন। তাফসরিশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। এই শাস্ত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো দুই খণ্ডের 'নাজরাতুন ফি কিতাবিল্লাহ'। প্রথম খণ্ডে সুরা ফাতিহা থেকে সুরা ইবরাহিম

পর্যন্ত, দ্বিতীয় খণ্ডে সুরা হিজর থেকে সুরা নাস পর্যন্ত। তিনি এই তাফসির রচনাকালে জগদ্বিখ্যাত তাফসিরগ্রন্থের সহযোগিতা নিয়েছেন। জয়নব গাজালির এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তিনি শিক্ষা ও প্যারেন্টিং বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। (জু্হুদুল মারআ আল মুআসিরা ফি তাফসিরিল কুরআনিল কারিম, পৃষ্ঠা ১০)

ফাওকিয়া ইবরাহিম আশ শিরবিনি : তিনি মিসরের একজন বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার। আরবি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি শায়খ শারাউয়ির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মসজিদভিত্তিক বিভিন্ন মজলিসে তিনি নারীদের তাফসিরের দরস দিতেন। তিনি সহজ-সরলভাবে কোরআনের তাফসির করতেন। তাফসির জগতে তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো চার খণ্ডের ‘তাইসিরুত তাফসির’। প্রায় সাত বছর সময় ও শ্রম ব্যয় করে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন।

ফাতেমা কারিমান : ১৯৪২ সালে মিসরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন ফাতেমা কারিমান। সাংবাদিকতার ওপর গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকতা করেন। এর পাশাপাশি তিনি টিভিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থাপিকা হিসেবেও কাজ করেন। বিভিন্ন দাওয়াতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সুবাদে তৎকালীন মিসরের বড় বড় আলেমদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং দ্বিনের পথে ধাবিত হন। ‘আল-লুলু ওয়াল মারজান ফি তাফসিরিল কোরআন’ নামক তিন খণ্ডের একটি তাফসিরগ্রন্থ রচনা করেন তিনি।

সামরা কুরুন জাকমাগিল : ১৯৪৮ সালে মাল্টায় জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিকভাবে তিনি দ্বিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং দ্বিনি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি একটি টিভি শোতে কোরআনের তাফসির পেশ করতেন। পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠানে প্রদত্ত তাফসিরকে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। দীর্ঘ ১২ বছর সময় শ্রম দিয়ে তিনি ১৩ খণ্ডের গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয় ‘তাফসিরুল কারি’। এই নাম দেওয়ার একটি প্রেক্ষাপট আছে। আন-নিদা পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মদ আল ফাতিহ একদা স্বপ্নে দেখেন তিনি সামরা কুরুনের একটি তাফসিরগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এই স্বপ্নটি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হলে তিনি গ্রন্থটির নাম দেন ‘তাফসিরুল কারি’ তথা পাঠকের তাফসির। এই গ্রন্থ রচনাকালে তিনি আধুনিক তাফসিরগ্রন্থের সহযোগিতা নেন। (জু্হুদুল মারআ আল মুআসিরা ফি তাফসিরিল কুরআনিল কারিম, পৃষ্ঠা ১৩)

কামেলা বিনতে মুহাম্মদ আল কাওয়ারি : কাতারের দাওহায় জন্মগ্রহণ করেন এই নারী তাফসিরবিদ। শৈশবেই কোরআনুল কারিম মুখস্থ করেন। তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন তিনি। লেখাপড়া করেন শরিয়া অনুষদে। তাসফির জগতে তাঁর

উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো 'তাফসিরু গরিবিল কোরআন'। এই গ্রন্থে তিনি আল-কোরআনের জটিল ও কঠিন শব্দগুলোর ব্যাখ্যা করেন।

নায়েলা হাশেম হাসান সাবরি : ১৯৪৩ সালে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। এবং আল আজহারে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। তাঁর পরিবার শিক্ষিত ও ধার্মিক পরিবার। তিনি শৈশব থেকেই কবিতা লিখতেন। তাঁর অসাধারণ কাব্যিক প্রতিভা ছিল। তাফসির জগতে তিনি **১১** খণ্ডের একটি বিশাল রচনা করেন, যার নাম 'আল মুবসির লিনুনিল কোরআন'। তিনি মহিলাদের নিয়ে অনেক তাফসিরের অনুষ্ঠান করেন।

ইসলাম ও আধুনিক মুসলিম নারী

মুসলিম নারীর সামাজিক দায়িত্ব

আধুনিক জীবন যাত্রার শ্রেষ্ঠত্বে যারা বিশ্বাসী তারা (১) কন্যাদের বিবাহে অভিভাবকত্ব, (২) বহু বিবাহ, (৩) তালাক ও (৪) পর্দা প্রথার মত ইসলামী মূল্যবোধকে নারী জাতির সামাজিক মর্যাদার হানিকর জ্ঞান করে থাকেন।

বিশ্বের সকল মুসলিম দেশেই অধুনা "সংস্কার আন্দোলন" নামে একটি আন্দোলন চলছে যা ইসলামের প্রারম্ভকাল থেকে ইসলামী বলে বিবেচিত বিধানগুলোকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায় এবং সে সকল ক্ষেত্রে অমুসলিম দেশগুলোতে প্রচলিত বিধানকেই চালু করতে চাচ্ছে।

এই নিবন্ধে আমি তাই নারী জাতি সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষার স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং এ ব্যাপারে তাদের ওপর অন্যায় আচরণ যে মারাত্মক সামাজিক ক্ষতির কারণ তা সবিস্তরে বর্ণনা করব। আধুনিক নারী সাম্যবাদীরা মুসলিম বালিকার স্বামী নির্বাচনে পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকের মতামতের প্রাধান্যকে খুবই দুঃখজনক বলে মনে করেন এবং এটাকে তারা তার প্রতি পিতার নিষ্ঠুর জুলুম ও ব্যক্তি স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন। তারা বহু বিবাহের মত ইসলামের অন্য কোন বিধানকেই এত খারাপভাবে নিন্দা করেননি। একে তারা মুসলিম নারীত্বের চরম অবমাননা ও স্বেচ্ছাচারী কামুকতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। এই "সংস্কারবাদীরা" একে কেবল চরম অধঃপতিত সমাজের জন্যই উপযুক্ত প্রথা বলে মনে করেন এবং একে শুধুমাত্র বিশেষ ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় বলে দায়ী করেন।

আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আমাদের এই আধুনিকতাবাদীদের এহেন দুঃখজনক স্বীকারোক্তির ভিত্তি আদৌ কুরআন কিংবা হাদিসে নেই। এটা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তাদের মানসিক দাসত্বের ফলশ্রুতি।

পাশ্চাত্য সমাজ যে তীব্র ঘৃণার সাথে বহু বিবাহ প্রথাকে দেখছে তার কারণ হলো তারা একাকীত্বের একটি অতিরঞ্জিত ধারণার দ্বারা অধিক মাত্রায় প্রভাবিত এবং সে ক্ষেত্রে তারা ব্যাভিচারকেও তেমন বীভৎস মনে করে না।

এটা অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের ব্যাপার যে, অনেক মুসলিম প্রধান দেশেও ইসলামের পারিবারিক বিধানকে এমনভাবে অংগচ্ছেদ করা হয়েছে যে, তাদের সমকালীন আইনে নবী (স), তার সাহাবায়ে কেরাম (রা) ও অন্যান্য মহাপুরুষগণ যাঁরা একাধিক বিবাহ করেছেন তাঁদেরকে অপরাধী হিসেবেই সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে। তালাক সম্পর্কিত ইসলামী আইনকেও তারা বহু বিবাহ প্রথার মত কর্কশভাবে অভিযুক্ত করেছেন। কোন ব্যক্তিকে শরীয়ত কর্তৃক তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অনুমতি প্রদানকে

ইসলামী নারী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার আর একটি প্রমান হিসেবে তারা উল্লেখ করেছেন। তারা একথা জোরে শোরেই বলেছেন যে, তালাকের মত এক তরফা স্ত্রী প্রত্যাখ্যান অবশ্যই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কারণ এটা খুবই সামান্য ও তুচ্ছ কারণে কাউকে তার স্ত্রী পরিত্যাগের অনুমতি প্রদান করে। সুতরাং তালাক অবশ্যই একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং ব্যাভিচার ও দুরারোগ্য পাগলামীর মত কোন মারাত্মক অবস্থার উদ্ভব হলেই শুধু কোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষে কাউকে তালাক দেয়া যেতে পারে। যেখানে ইসলামী শরীয়ত পারস্পরিক সহাবস্থানে অসহনশীল একটি অসুখী দম্পতিকে তাদের সমস্যার একটি সুন্দর ও সম্মানজনক সমাধানের ব্যাবস্থা প্রদান করেছে, সেখানে ঐ সকল "সংস্কারবাদী"রা বলেছেন যে, এই অসঙ্গত মেজাজের দু'টো নারী-পুরুষকেও তাদের বিবাহ বন্ধনকে ধরে রাখতে বাধ্য করতে হবে।

দু'জন নারী-পুরুষ যদি পারস্পরিক সন্তুষ্টি খুঁজে না পায় তবে কোন ধর্মহীন নৈতিকতাই যেহেতু তাদের একে অপরকে ভালবাসতে বাধ্য করতে পারে না, সুতরাং তারা অন্যত্র ভালোবাসা খুঁজবেই। পারিস্পরিক অসন্তুষ্টিপূর্ণ এ দুঃসহ সহাবস্থান থেকে মুক্তি পেতে তাদের একটি মাত্র উপায় থাকে, তা হলো মিথ্যা ও কুৎসার মাধ্যমে তালাকের জন্য কোর্টকে প্ররোচিত করা, আর যেহেতু এই মিথ্যা অপবাদ তাদের জন্য সামাজিক গ্লানির কারণ হয়, সেহেতু পুরো ব্যাপারটাই তাদের নৈতিক অধঃপতন ও ধ্বংস ডেকে আনে।

কোর্টে প্রমাণযোগ্য যথার্থ কারণ ছাড়া যে তার স্ত্রীকে তালাক দেয় সে খারাপ লোক বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু মানসিক পীড়নের মধ্যে আজীবন ধরে না রেখে মেয়ে লোকটিকে পছন্দমত বিবাহ বন্ধনের সুযোগ দেয়া যেকোন মানবিক বিচারেই খারাপ হবার নয়। তথাপি আমাদের আধুনিক সংস্কারবাদীরা এহেন অবস্থায়ও নারীটিকে আজীবন ঝগড়া-ঝাঁটি ও মানসিক পীড়নের মধ্যে রাখার জন্য আইন তৈরিতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

পর্দা বা নারী-পুরুষের অবাঞ্ছিত মেলামেশা থেকে পৃথকীকরণ ব্যাবস্থাকেও আধুনিক শিক্ষিতরা মোটেই কম ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখছেন না। তারা অমুসলিমদের মতই নারী দেহের অবগুণ্ঠন উন্মোচনে বদ্ধপরিকর। তাই তারা নারীদের জন্য সহশিক্ষা, ভোটাধিকার, দেশের বাইরে চাকরি গ্রহণ এবং সাধারণ্যে সকল কাজে পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বশীলদের প্রবর্তিত এই "নারী স্বাধীনতার" সর্বোচ্চ চিত্র হলো- রাজপথে নেকাব উন্মোচিত মেয়েদের জাতীয় সঙ্গীতের তালে তালে ব্যানার দুলিয়ে উন্মত্ত কুচকাওয়াজ, নির্বাচনে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের ভোট প্রদান, সেনাবাহিনীতে পুরুষ সৈনিকের পোশাকে সজ্জিত নারী, কল কারখানায় পুরুষের সাথে

কর্মরত মেয়েলোক এবং আনন্দ মেলার উপহার বিপণীর সজ্জিত পশুর মত জাতীয় সুন্দরী প্রতিযোগীতার বিচারকগণ কর্তৃক আগত সুন্দরী ললনাদের দেহ ও সৌন্দর্য চোখে দেখার দৃশ্য।

আধুনিক সভ্যতায় নারীর সম্মান ও শ্রদ্ধার মাপকাঠি নির্ধারিত হয়ে থাকে পুরুষের সকল কাজে তার অংশগ্রহণ এবং এর সঙ্গে তার সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে উন্মুক্ত করার মাধ্যমে। ফলে সমসাময়িক ঐ সমাজে নারী ও পুরুষের উভয়ের পার্থক্য নির্ধারক সকল কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপে গুলিয়ে যায়।

ইসলামী শিক্ষা এই ধরনের বিপথগামী যৌনতামূলক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না।

ইসলাম নারীকে পুরুষের অঙ্গনে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়নি। তার দায়িত্ব নির্ধারিত হয়েছে তার ঘরে, তার স্বামীর সংসারে। তার সার্থকতা ও সফলতা নির্ধারিত হয়েছে স্বামীর প্রতি তার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা এবং মানিক-রতন সন্তানদের লালন-পালনের মধ্যে। সকল মুসলিম নারীরই পছন্দের বিষয় হলো গোপনীয়তা, আর এ জন্য পর্দাই হচ্ছে অপরিহার্য মাধ্যম।

জীবন নাট্যের যে দৃশ্যের পুরুষ হবেন ইতিহাসের নায়ক, সে পটভূমিকায় পর্দার অন্তরালে নারী হবেন তার সকল কর্মকান্ডের সহায়ক। নারীর এই কর্মকান্ড কম উত্তেজক হলেও অধিকতর বিনম্র এবং সুষ্ঠু জীবন ধারার স্থিতিশীলতা, বিকাশ ও পবিত্রতা রক্ষায় তা কোনমতেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মা হিসেবে মুসলিম নারীর দায়িত্ব

একজন মুসলিম জননীর প্রাথমিক দায়িত্ব হল সন্তানদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা অনুযায়ী অনুপ্রাণিত করা।

অনারবীয় এলাকায় যে সকল মুসলিম নারী প্রত্যহ সকালে ভক্তিভরে কুরআন পড়েন তাদের অধিকাংশই তার সামান্যতম অর্থও জানেন না, কিংবা জানার চেষ্টাও করেন না।

ধর্মীয় ঝোঁক প্রবণ অথচ আধুনিক শিক্ষায় গড়ে ওঠা অনেক মেয়েই কুরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে থাকে। কিন্তু এগুলোকে তারা নোবেল নাটকের মতই ভাবে, কিংবা ভাবে কোন বিমূর্ত দর্শন হিসেবে। ইসলাম সম্পর্কিত এই পড়াশুনা তাই তাদেরকে এক মুহুর্তের জন্যও নোংরা ছায়াছবি দর্শন, অশ্লীল সংগীত শ্রবণ ও গানের তালে তালে অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন কিংবা অশালীন দেহ-আটা পোশাক পড়ে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে সমর্থ হয় না।

এক্ষেত্রে মুসলিম মায়েদের কর্তব্য তাদের বেড়ে ওঠা ছেলে-মেয়েদেরকে এ কথা বুঝানো যে, স্কুল-কলেজে তাদের অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব যা করছে তা আসলে ঠিক নয়। মুসলিম নারী কুরআন-হাদীস পড়বেন এই উদ্দেশ্যে যেন তাদের দৈনন্দিন জীবনে তার শিক্ষা বাস্তবায়িত হয়।

অনেক মুসলমানের ঘরেই দেখা যায়, তাকের ওপরে সুন্দর সিল্কের কাপড়ে আবৃত করে কুরআন শরীফ রেখে দেয়া হয়েছে, যেন ময়লা পড়ার জন্যই। অব্যবহৃত এই অসংখ্য কুরআন আর্তি করে বলছে "ওহে মানুষ আমাকে বন্ধন মুক্ত কর, আমাকে পড়, আমাকে অনুসরণ কর।"

যে মায়েরা মহিলা বিষয়ক পত্রিকাদি পড়তে অভ্যস্ত তারা সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি তাদের যুব সন্তানদের তীব্র বিদ্রোহাত্মক দৃষ্টিভংগিকেও সহজেই সমর্থন করে বসেন। এমনকি তাদের নির্বোধ, ঘৃণ্য আচরণ ও তুচ্ছ চপলতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ এবং গতানুগতিকতার প্রতি সর্বাত্মক অনীহাকেও তারা প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। এই মায়েরা মনে করেন, "নাস্তিকতা ও বস্তুবাদ হচ্ছে যুব কিশোরদের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এক জৈবিক বাস্তবতা। একে তারা একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন হিসেবে গ্রহণ করবেই। সুতরাং তাদেরকে এ সর্বব্যাপি ঝোঁক প্রবণতার ওপর ছেড়ে দেয়াই উচিত।"

এটা সম্পূর্ণ একটি প্রতারণাপূর্ণ কথা। এর কোন যৌক্তিকতাই থাকতে পারে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথাকথিত প্রগতিবাদীদের প্রচার প্রচারনাই তাদেরকে এ নৈরাশ্যের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

গণ মাধ্যমগুলোতে তারা যা শোনে ও দেখে এবং তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা যা শেখে, তাদের গৃহে আচরিত কিংবা শিখানো মূল্যবোধের সাথে তার কোন মিল না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এসব গণমাধ্যম যদি পাশ্চাত্য জীবন-পদ্ধতি শিক্ষা না দিয়ে ইসলামী জীবন ধারার শিক্ষা দিতো তাহলে এই যুবক-যুবতীরা চিন্তা-বিশ্বাস এবং অনুভূতি ও আচরণে সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারতো। এই অত্যাবশ্যকীয় পরিবর্তন সাধনে শিক্ষিত জননীরাই কেবল তাদের সন্তানদের ওপর পরম কার্যকরী প্রভাব খাটাতে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারেন।

পর্দা সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষার দাবীই হচ্ছে মহিলাগণ ব্যক্তিত্ব ও সম্মানের সাথে একাকীত্বে বাস করবেন, নিতান্ত প্রয়োজনে আত্মীয়-সজন ও পুরুষ বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাতের জন্য বের হওয়া ছাড়া অধিকাংশ সময় তারা নিজ গৃহে অবস্থান করবেন। একজন মা তার বেড়ে ওঠা সন্তানদের সামনে তার ব্যক্তি জীবনে অনুশীলিত কার্যাদির দ্বারাই সুন্দর উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারেন। যে জননী সর্বদা তার ঘর-কন্যার কাজে নিজেকে সাচ্ছন্দ রাখেন, রান্না-বান্না, তদারকী ও শিশুদের পরিচর্যায়

ব্যাপৃত থাকেন, নিয়মিত নামায পড়েন, কুরআন অধ্যয়ন ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগীর কাজে ব্যস্ত থাকেন, তিনিই তার পরিবারে এমন একটি অনুকূল ইসলামী পরিবেশ সৃষ্ট করতে সক্ষম, যার দ্বারা তার শিশু সন্তানেরা গভীরভাবে প্রভাবিত হবে এবং বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে সে যখন বাইরের পরিবেশে মিশবে তখন অবাঞ্ছিত আচরণ দ্বারা আকৃষ্ট হবে না। এজন্য খুব অল্প বয়স থেকে শিশুদের ইসলামী শিক্ষা প্রদান করা উচিত। হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসুল (স) এঁর সাহাবা-ই-কেরাম (রা) এঁর সন্তানগণ এমনকি ন্যাংটা থাকাকালীন বয়সেও কুরআন আবৃত্তি করতে পারতেন।

শিশুরা যখন কথা বলতে শিখে তখনই তাকে কালিমা শিক্ষা দেয়া উচিত এবং বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু আকবার, ইনশাআল্লাহ্, মাশাআল্লাহ প্রভৃতি ইসলামী ভাবাবেগপূর্ণ কথামালাও শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। শিশু যখনই দাঁড়াতে ও হাঁটতে শিখে তখনই মায়ের অনুকরণে তাকে নামাযের মহড়া করতে অনুপ্রাণিত করা উচিত। শিশুর বয়স যখন সাত বছর হবে তখন মায়েদের উচিত তাদেরকে নামায পড়তে চাপ দেয়া এবং দশ বছরেও নামায না পড়লে শিশুদের শাস্তি দেয়া প্রয়োজন। এভাবে শিক্ষা দিলেই শিশুরা বুঝদার হওয়ার অনেক আগে থেকেই স্রষ্টা ও মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

বয়স ও মেধা অনুসারে এ সকল কর্তব্য পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে শিশুদেরকে সহজ-সরল ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা প্রদান করা উচিত। এ ক্ষেত্রে মায়েদের কর্তব্য শিশুদেরকে অতীত ও বর্তমেনের মুসলিম মহৎ ব্যক্তিত্বের রোমাঞ্চকর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে পরিচিত করে তোলা এবং তাদের নিজেদের জীবনে ঐ সকল মূল্যবোধ মেনে চলার তীব্র আকাংখা সৃষ্টি করা। শিশুরা যখন একটু বড় হয়ে ওঠে এবং নিজেরা ইচ্ছা করে বই পুস্তক পড়তে পারে তখন বাসগৃহের পরিবেশ এমন সব ইসলামী বই পুস্তক রাখা প্রয়োজন যা শিশুদেরকে পড়তে আকৃষ্ট করে।

যে সব ছেলেমেয়ে বেশ বড় হয়েছে কিংবা যৌবনে অবতীর্ণ হয়েছে তাদেরকে প্রেক্ষাগৃহে নোংরা ছায়াছবি ও রেডিও-টিভির অর্থহীন প্রোগ্রামগুলো কেবল দেখতে নিষেধ করলেই চলবে না বরং সেগুলোর খারাপ দিকটা তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে হবে। ঘরে যদি রেডিও অথবা টেলিভিশন সেট থাকে তবে মায়েদের উচিত কুরআন তিলাওয়াত, সংবাদ বুলেটিন, ভালো কবিতা আবৃত্তি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রোগ্রামগুলো ছাড়া অন্য সব প্রোগ্রাম শোনা থেকে সন্তানদেরকে সম্পূর্ণ বিরত রাখা। কোন অবস্থাতেই শিশুদেরকে পাপ সংগীত শুনতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ শিশু চরিত্রের ওপর এর চেয়ে খারাপ নৈতিক প্রভাব ফেলার মত আর কোন প্রোগ্রাম নেই। যদি শিশু কখনো প্রতিবেশীর রেডিও-টিভি থেকে শুনে এ সকল খারাপ গান গাইতে শুরু করে তবে

মায়েদের উচিত তাদেরকে চুপ থাকতে ব্যাধ করা এবং এসব নোংরা গান গাইতে লজ্জাবোধ থাকা উচিত বলে ধিক্কার দেয়া।

মুসলিম মায়েদের কোন অবস্থাতেই তাদের সন্তানদেরকে খৃস্টান মিশনারী স্কুলে বা আশ্রমে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে পাঠাতে সম্মত হওয়া উচিত নয়। কারণ সেগুলোতে ছেলেমেয়েরা খৃষ্টধর্ম ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হবেই। এমনকি সরকারি স্কুলগুলোতেও নৈতিক শিক্ষার জন্য তেমন ভালো ফল আশা করা যায় না।

তাই এ ক্ষেত্রে সামর্থ থাকলে গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে কিংবা অসমর্থ হলে মসজিদে পাঠিয়ে ছেলেমেয়েদেরকে আরবী ভাষা, কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা প্রদানের সাহায্যে বস্তুবাদী শিক্ষার ক্ষতিপূরণ করা যেতে পারে। পারলে মা নিজেও তার সন্তানদেরকে এ ধরনের শিক্ষা দিতে পারেন।

প্রত্যেক মায়ের উচিত বাচ্চাদের স্কুল পাঠ্য সমস্ত টেক্স বই ভালোভাবে পড়ে দেখা। এগুলোতে যেসব বিষয় অসত্য, ভুল ও ক্ষতিকারক তা বাচ্চাদেরকে ধরিয়ে দেয়া এবং নিঃসন্দেহ প্রমাণে সেগুলোর অসত্যতা বুঝিয়ে দেয়া।

মুসলিম মায়েদের উচিত তার সাধ্যের সীমার মধ্যেই বাসগৃহকে আকর্ষনীয় করে তোলা। এ দেশের প্রায় সকল গৃহই, এমনকি মধ্যবিত্তের ঘরবাড়ীও অনেক ক্ষেত্রে অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা। অনেক মহিলাই মেঝেতে, বিশেষ করে উঠোন ও রান্না ঘরে আবর্জনা ছড়িয়ে রাখেন। তাদের এ একটা খারাপ অভ্যাস যে, তারা ময়লার মধ্যে থাকবেন তবুও নিজ হাতে তা পরিষ্কার করবেন না। ইসলামী শিক্ষা মেয়েদেরকে অবশ্যই পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মানুবর্তিতা শিখায়। নিজেদের হাতে ঘর ঝাড়ু দিতে কিংবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মুসলিম নারীকে কখনই লজ্জাবোধ করা উচিত নয় এবং চাকর-চাকরানীদের ওপর সবসময় এ ব্যাপারে নির্ভরশীল হওয়া ঠিক নয়। যদি সম্পদশালী হন তবে সর্বদা জাঁক-জমক ও অপচয় এড়িয়ে চলতে হবে এবং পশ্চিমা ধাঁচের সোফা, ড্রেসিং টেবিল, খেলোগয়না ইত্যাদি ব্যয় বহুল গৃহসামগ্রী পরিহার করতে হবে। কুরআন ও হাদিসের বানী সম্বলিত কারুকার্যপূর্ণ ক্যালিগ্রাফি দিয়ে ঘরের দেয়াল সজ্জিত করা যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন ঘর সাজানো হবে অন্যদিকে তা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে, এটা মুসলিম বাসগৃহও। ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক ধরণের ছবি, পারিবারিক কিংবা বন্ধু-বান্ধবের একক ও গ্রুপ ফটোগ্রাফ ইত্যাদি কিছুতেই ফ্রেমে আটকিয়ে ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা ঠিক নয়। ইসলামী শিক্ষা একজন বালিকাকে গৃহকর্মের জন্য অন্তত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মুল্যনীতি, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং মজাদায়ক হালাল খাদ্য তৈরির পদ্ধতি শেখায়। অনেক মুসলিম নারীই খাদ্যের পরিপুষ্টি জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই প্রয়োজনীয় ও উপযোগী প্রচুর খাদ্য হাতের কাছে থাকতেও তারা তাদের বাচ্চাদেরকে তা খাওয়াতে জানেন না।

একজন অশিক্ষিত ও উদাসীন মুসলিম নারী কিছুতেই অনৈসলামিক প্রভাব যা দিবারাত্রি তার সন্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা প্রতিহত করতে পারেন না। শুধুমাত্র একজন শিক্ষিত, চতুর ও অত্যন্ত আগ্রহশীল মুসলিম নারীই পারেন বর্তমান প্রতিকুল পরিবেশের সামনে সাহসের সাথে মুখোমুখি হতে।

———————————

নারী স্বাধীনতা ও কাসেম আমীন

নারী ও পুরুষের যৌন পবিত্রতার সংরক্ষণ, পর্দা করা, মেয়েদেরকে বিশ্বস্ত স্ত্রী হিসেবে গৃহে অবস্থান করা, সন্তান পালনে ও ঘরণীর কাজে নারীকে নিয়োজিত থাকা, স্বামীকে পরিবারের কর্তা ও জীবিকা উপার্জনকারী হিসেবে মেনে নেয়া, স্ত্রী তালাক ও বহু বিবাহে পুরুষের অধিকার থাকা প্রভৃতি প্রথাগুলো মুসলিম সমাজে মহানবী (স), তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামদের যুগ থেকে দীর্ঘ তেরশত বছরেরও অধিককাল ধরে অনুশীলিত হয়ে আসছে। কোন ফকিহ কিংবা কোন মাজহাবের কোন আলেমই এ ব্যাপারে কখনো কোন প্রশ্ন তোলেননি। সকলেই নির্দ্বিধায় এ বিধানগুলো মেনে নিয়েছেন। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম বিশ্বের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন নামধারী মুসলিমও কোরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত মুসলিম নারীর এই সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে কোন কটাক্ষ করার সামান্যতম সাহসও পায়নি।

ইতিহাসে প্রথম যে মুসলিম নামধারী ব্যক্তি পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে কথা তোলেন তার নাম কাসেম আমীন (১৮৬৫-১৯০৪) । কাসেম আমীন চুকেন একজন কুর্দী। পেশায় বিচারক। তিনি শেখ মোহাম্মদ আবদুহের শিষ্য ছিলেন। তিনি তার জীবনের অধিকাংশ সময় কায়রোতে অতিবাহিত করেন। তার ফার্ষি ভাষা শিক্ষাকালে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচারণায় তার মনে বিশ্বাস জন্মায় যে, পর্দা, বহুবিবাহ ও তালাক প্রথা মুসলিম সমাজের পিছিয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ। এই ফরাসী শিক্ষা যতই তাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎকৃষ্টতার পক্ষে যুক্তি দেয়, ততই তার নিজের সম্পর্কে নিকৃষ্টতার ধারণা জমতে থাকে। পরবর্তীতে তিনি লিখেন, "সত্যিকার সভ্যতা হবে বিজ্ঞান নির্ভর। সত্যিকার বিজ্ঞানের বিকাশের পুর্বেই ইসলাম যেহেতু তার পূর্ণতায় পৌঁছেছে; সুতারাং একে সভ্যতার আদর্শ ধরা যায় না"। তিনি আরও বলেন ইসলামের নৈতিক ভিত্তি দূর্বল। তিনি বলেন, "মুসলমানগণ, এমনকি মহানবী (স)-এর সময়ের মুসলমানগণও অন্য লোকদের চেয়ে কোন দিক দিয়ে ভালো ছিল না।" তার মতে, "পূর্ণতা ও চরম শ্রেষ্ঠত্বের পথ হল বিজ্ঞান। ইউরোপ বিজ্ঞানে যত বেশী অগ্রবর্তী হয়েছে, সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বেও তত বেশী এগিয়ে গেছে।" তিনি আরও লিখেন, "ইউরোপ সকল দিক দিয়েই

আমাদের থেকে অগ্রবর্তী। যদিও আমরা ভেবে আনন্দ পাই যে, ইউরোপীয়রা বস্তুগতভাবে আমাদের চেয়ে সম্পদশালী হলেও নৈতিক দিক দিয়ে আমরা তাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতরও; কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। ইউরোপীয়রা আমাদের চেয়ে নৈতিক দিক দিয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী। তাদের সকল শ্রেণীর মধ্যেই সামাজিক নৈতিকতা রয়েছে। ইউরোপে নারী স্বাধীনতাও কোন প্রথা বা অনুভূতি সৃষ্টি হয়নি। বরং তা বিজ্ঞান ও নৈতিকতা নির্ভর। তাই ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে এর নৈতিক দিকটিকে বাদ দিয়ে গ্রহণ করা অর্থহীন। এ দু'টো জিনিস অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কশীল। সুতারাং আমাদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিৎ।"

এই চিন্তাধারাই কাশেম আমীনকে ১৯০১ সালে পর্দা বিরোধী 'দি নিউ ওম্যান' নামক বইটি লিখতে আরম্ভ করে। এই বিষয়ে তিনি মুসলিম পারিবারিক জীবনকে ভীষণ খারাপভাবে চিত্রিত করেছেন। স্যামুয়েল জেম্মার নামক একজন পাশ্চাত্য লেখকের 'চাইল্ড হুড ইন দি মোসলেম ওয়ার্ল্ড' নামক বই থেকে কাশেম আমীন তার বইয়ে এমন উদ্ধৃতি টেনেছেন যে, "মুসলিম সমাজে পুরুষ হল নারীর নিরঙ্কুশ প্রভু। নারী তার আনন্দের বস্তু, যেমন একটি খেলনা, যা নিয়ে সে যেমন ইচ্ছা খেলতে পারে। জ্ঞান সমস্ত পুরুষের, আর নারী নির্বোধ, সব অজ্ঞতা তার জন্য। মুক্ত আকাশ ও সব আলো পুরুষের জন্য, আর নারীর জন্য সকল অন্ধকার ও বন্দীদশা। পুরুষ শুধু আদেশ করবে, আর নারী তা নীরবে মেনে চলবে। সব কিছুই পুরুষের, আর নারী তার এই সব কিছুর একটি তুচ্ছ অংশ মাত্র।" এই কাশেম আমীনই হলো মুসলিম নামধারী প্রথম ব্যক্তি যে মুসলিম পরিবারকে পশ্চিমা ধাঁচে পুনর্বিন্যাস করে গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তার বইয়ে আলবার্ট হয়রানীর, "এরাবিক থট ইন দি লিবারেল এজ" নামক বই থেকে এভাবে উদ্ধৃতি টানেন যে, "প্রাচ্য দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, দেখবে নারীরা পুরুষের নিকট দাসত্বের শিকলে বন্দী হয়ে আছে। পুরুষরা তাদের শাসক। পুরুষ অত্যাচারী এবং সে যতক্ষণ ঘরে থাকে ততক্ষণ সে এই অত্যাচার চালাতে থাকে। পক্ষান্তরে তাকিয়ে দেখ ইউরোপীয় দেশগুলোর দিকে, সেখানে প্রতিটি সরকার মানুষের স্বাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে এবং নারীকে দিয়েছে চিন্তা ও কাজে উচ্চতর স্বাধীনতা ও সম্মান।"

কাশেম আমীন উক্ত বইয়ে আরো লিখেন, "মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ হলো, অজ্ঞতার কারণে সামাজিক মূল্যবোধের বিনাশ সাধন। এই অজ্ঞতা শুরু হয় পরিবার থেকে। এই অবস্থার উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন প্রয়োজন। এ শিক্ষার মাধ্যমে নারী শুধু পারিবারিক সমস্যা থেকেই বাঁচবে না, বরং পুরুষ উৎপীড়কের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে স্বাবলম্বী করতেও পারবে। এই শিক্ষা নারীকে অবগুণ্ঠন, নির্জনবাস ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দিবে।" নারীর গৃহে অবস্থানকে কাশেম

আমীন এই বলে ক্ষতিকর মনে করেন যে এটি নারীর প্রতি পুরুষের অবিশ্বাস থেকেই উৎসারিত। পুরুষ নারীকে শ্রদ্ধা করে না, তারা তাদেরকে গৃহ বন্দী করে রাখে। কারণ, তারা নারীকে পুরোপুরি মানুষই বলে স্বীকার করে না। পুরুষ নারীর মানবীয় গুণাবলীকে অস্বীকার করে এ জন্য যে, সে শুধুই নারীর দেহকেই ভোগ করতে চায়। বহু বিবাহ সম্পর্কেও কাশেম আমীন একই ধারণা পোষণ করেন। তার মতে, কোন নারীই পারেনা তার স্বামীকে অন্য নারীর সাথে অংশীদার করতে। যদি কোন পুরুষ দ্বিতীয় বিবাহ করে, তবে তা তার প্রথম স্ত্রীর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করেই সম্ভব। তালাক প্রথাকেও তিনি ঘৃণার সাথে দেখেন। তিনি বলেন, যদি এই প্রথা চালুই রাখা হয়, তবে নারীকেও এ ব্যাপারে সমঅধিকার দিতে হবে। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সমঅধিকার না পাবার কোন যুক্তি নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে তিনি নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের পূর্বে সুদীর্ঘকাল শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত বলে জোর দেন।

কাসেম আমীনের 'দি নিউ ওম্যান' আধুনি মুসলিম নারীকে খৃষ্টান ও মানবতাবাদী আদর্শের শৃঙ্খলে বন্দী করার এক সুস্পষ্ট ঘোষণা। যে কেউ এ বই পড়বে তাকে বাস্তবিকই বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে, এর লেখক একজন মুসলমান, কোন খৃস্টানধর্ম প্রচারক নন।

মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে 'দি নিউ ওম্যান' পুস্তকের এই বাদানুবাদের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। কাসেম আমীন যা বলেছেন তা সম্পুর্ণরুপে মুসলিম নারীদের প্রকৃত অবস্থাকে নিরপেক্ষ ও খোলা মন নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখার সামান্যতম চেষ্টা ব্যাতিরেকে এবং খৃষ্টান মিশনারীদের সকল আক্রমণকে অন্ধভাবে গ্রহণের ফলেই হয়েছে। প্রকৃত সত্য কথা হল- এই অধঃপতনের যুগেও অধিকাংশ মুসলিম পরিবার থেকে পারস্পারিক ভালোবাসা ও সহানুভূতির দ্বীপ্তি বিকীর্ণ হচ্ছে। বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে মুসলিম দেশগুলোতেই পারিবারিক বন্ধন মজবুত। এই ঐতিহ্যগত পারিবারিক বিন্যাসের ফলে মুসলিম নারীগণ পরিবারের মা ও বধূ হিসেবে প্রভূত সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা পাচ্ছেন। তারা তথাকথিত পুরুষ নিপীড়কের ভয়ে পর্দা পালন করছে না; বরং এতে তার জন্য প্রচুর কল্যাণ নিহিত আছে জেনেই করছেন। এতে তাকে যে কিছু মানসিক চাপ সহ্য করতে হয়, তা নয়। তবে সেটা নারীর সামাজিক অমর্যাদার কারণে নয়, বরং তা প্রচলিত নৈতিক অবক্ষয় ও বঞ্চনার কারণেই।

১৯৬১ সনের ১লা এপ্রিল আমাকে লেখা একটি ব্যক্তিগত পত্রে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী উল্লেখ করেন, "পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী জাতির প্রতি খুবই নিষ্ঠুর প্রমাণিত হয়েছে। এই সভ্যতা নারীকে একদিকে প্রকৃতগত নারীত্বের দায়িত্ব পালন করাচ্ছে, অন্যদিকে তাকে একই সাথে পুরুষের বহুবিধ কাজে

অংশগ্রহণের জন্য ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছে, এভাবে তারা নারীকে দু'টো শানপাথরের মাঝখানে চৌকোণাভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অধিকন্তু তাদের প্রচারণা নারী সমাজকে পুরুষদের কাছে নিজেকে প্রতিযোগীতামূলকভাবে আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রলুব্ধ করেছে। এই প্রতিযোগীতায় তারা স্বাভাবিক শালীনতাকে বিসর্জন দিয়ে অপর্যাপ্ত পোশাক, এমনকি নগ্নতা পর্যন্ত গড়িয়েছে। এভাবে তারা পুরুষের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে। একমাত্র ইসলামই নারীকে এই দূর্গতি থেকে রক্ষা করতে পারে। কারণ, ইসলাম একজন নারীকে শুধুমাত্র একজন পুরুষের জন্যই নির্দৃষ্ট করে দেয় এবং তার প্রকৃতিগত কাজে নিরাপত্তা দিয়ে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীকে অসংখ্য পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য সেবাদাসীতে পরিণত করেছে। এবং যে সকল কাজ সত্যকারভাবে একজন রমণীর জন্য শোভনীয় সে সকল কাজের প্রতি তার হৃদয়ে একটি মিথ্যা লজ্জার ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছে। পরিবার ও সংসারকর্ম সংক্রান্ত ইসলামী নীতিমালাই একজন নারীর জন্য যথার্থভাবে উপযুক্ত এবং তার প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ন সামঞ্জস্যশীল।"

পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য অন্ধ আনুগত্যের ফলে ১৯০১ সনে কাসেম আমীন বুঝতেই পারেননি যে, পাশ্চাত্যের এই নারী মুক্তিবাদী প্রচারণা পরবর্তী প্রজন্মকে ব্যাপকভাবে অবাধ, সার্বজনীন ও অবৈধ যৌনতা চরিতার্থতার দিকে নিয়ে যাবে এবং তা মানুষের সহজাত পারিবারিক বন্ধনকে সম্পূর্ণরুপে ছিন্ন করে দেবে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কাসেম আমীন তার এই বইয়ের মাধ্যমে মুসলিম রমণীর পর্দার বিরুদ্ধে প্রচারণার যে তুফান তুলেছিলেন তার প্রতি খৃষ্টান মিশনারী ও পশ্চিমা আধিপত্যবাদীদের সর্বাত্বক সমর্থনের ফলে তা মুসলিম সমাজের অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করে। এই প্রচারণার ফলে প্রত্যেক মুসলিম দেশে আগাছার মত একদল উশৃংখল মহিলা বেড়িয়ে আসলো- যারা মুসলিম নারীর সঠিক দায়িত্বানুভূতিকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের জীবন পদ্ধতিকে পশ্চিমা নষ্ট মেয়েদের জীবন পদ্ধতির সাথে একাকার করে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

———————-

নারী স্বাধীনতা ও ইসলাম

আধুনিক বিশ্বে এমন কোন মুসলিম দেশই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে দেশ পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতাবাদীদের মারাত্বক প্রচারণার স্বীকার হয়নি এবং পর্দা প্রথাকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় বিধানরুপে চিহ্নিত করেনি, কিংবা তথাকথিত নারী স্বাধীনতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির অপরিহার্য অংশ হিসেবে মেনে নেয়নি। যেমন- ১৯৭৬ সনের ১৯শে অক্টোবর পাকিস্তান টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর মুহাম্মদ মুকাদ্দাম বলেন, "কোন দেশেই আধুনিকীকরণ করা সম্ভব নয় যদি না সে দেশের নারী সমাজকে ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা যায়। প্রাচ্যের অনেক দেশেই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগতে দেরী হয়েছে নারী সমাজকে স্বাধীনতা দানের ব্যাপারে সে সকল দেশের জনগণের মাঝে প্রোথিত গোঁরামী ও আদিম বিশ্বাসের কারণেই। পৃথিবীর অপরাপর দেশের সাথে যদি তাল মিলিয়ে না চলতে পারি তাহলে আমরাও স্বাধীন জাতি হিসেবে টিকে থাকতে পারবো না। এশিয়ার ও আফ্রিকার সকল উন্নয়নশীল দেশে নারী সমাজের ভূমিকা সুস্পষ্ট। দেশের উন্নয়নের জন্য তাদেরকে অবশ্যই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ জরতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো দেশের কিছু সংখ্যক লোক বিষয়টি বুঝতেই চায় না।"

১৯৭৬ সনের আগস্ট মাসে পাকিস্তান জাতীয় সংহতি পরিষদের উদ্যোগে লাহোরে অনুষ্ঠিত "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দু'দশকে নারী স্বাধিকার" শীর্ষক সেমিনারে উপরোক্ত বক্তব্যের ঠিক এইরূপ মন্তব্য করা হয়। যদি আমরা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করি এবং আমাদের এই দেশ গঠনের আদর্শিক ভিত্তি ইসলাম বলে মনে করি তবে কি এটা জানা আমাদের জন্য কর্তব্য হয় না যে, ইসলাম নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছে ?

নারী অধিকার সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে গিয়ে সূরা নিসার ৩৪নং আয়াতে বলা হয়েছে, "পুরুষরা হচ্ছে নারীদের তত্বাবধায়ক। কারণ, আল্লাহ্ পুরুষদেরকে নারীদের চেয়ে বেশী যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং পুরুষেরা নারীদের জন্য তাদের অর্থ ব্যয় করে।"

এ কথার তাৎপর্য হলো, কোন মুসলিম নারীই ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের জীবিকা অর্জনে বাধ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জীবন ধারণের মত সামর্থ থাকবে, তার স্বামী মারা না যাবে কিংবা সে তালাক প্রাপ্তা না হবে অথবা তার ভরণপোষণ দেয়ার মত কোন পুরুষ আত্মীয় থাকবে।

কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী স্বামী তার স্ত্রীর জন্য বন্ধু ও কর্তা। স্বামীর কর্তব্য হলো স্ত্রীর প্রতি ন্যায়নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও দয়া প্রদর্শন করা এবং এর প্রতিদানে স্ত্রীর দায়িত্ব হলো স্বামীর প্রতি বাধ্য ও অনুগত থাকা এবং স্বামী যাতে চরিত্রহীন হতে না পারে সে জন্য তার প্রতি অকৃত্রিম আস্থা নিবেদন করা।

কোরআনে স্বামীকে স্ত্রীর চেয়ে একমাত্রা ওপরে স্থান দেয়া হয়েছে এ জন্য নয় যে, সে নির্মম অত্যাচারী হবে, বরং তার দ্বারা পারিবারিক সুরক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবে সে জন্যেই। যে পরিবারে স্ত্রী আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর সে পরিবারে স্বামী স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের কর্তৃত্বের ভূমিকা হারায়। পক্ষান্তরে পরিবারে মায়ের কর্তৃত্ব বেড়ে গেলে পিতার প্রতি সন্তানদের শ্রদ্ধাশীলতা হ্রাস পায়।

সুরা আন-নূরের ৩০-৩১ নং আয়াতে মুসলমান পুরুষদেরকে গায়ের মুহাররাম নারীদের প্রতি এবং মুসলিম নারীদেরকে গায়ের মুহাররাম পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। পুরুষ ও নারী উভয়কেই বলা হয়েছে পরস্পরের চক্ষুকে অবনমিত রাখতে। মেয়ে লোকদেরকে মাথায় চাঁদর পরতে বলা হয়েছে এবং তার আঁচল দিয়ে মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ ঢেকে রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদেরকে তাদের স্বামী ও বিবাহ নিষিদ্ধ নিকটাত্মীয়দের ছাড়া আর কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রায়োগিক ভাবে এই আয়াত দ্বারা মুখমণ্ডলে কসমেটিক্স লাগানো এবং যৌন আবেদন সৃষ্টি করে এমন সব পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ হয়েছে।

হাদিস থেকে জানা যায়, রসূল (স)-এঁর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা)-এঁর ছোট বোন হযরত আসমা (রা) একদিন পাতলা কাপড়ের পোশাক পরে রসূল (স)-এঁর সামনে আসলে মহানবী তাঁকে এই বলে তিরস্কার করেছিলেন যে, যখন কোন মেয়েলোক বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন থেকে তার মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ছাড়া কোন কিছুই প্রকাশ করা উচিত নয়। সূরা আল আযহাবের ৫৫নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ নবী (স)-এঁর স্ত্রীদের ঘরে গায়রে মুহাররাম পুরুষ ও বেগানা মহিলাদেরকে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং ৫৯নং আয়াতে মুসলিম নারীদেরকে আকর্ষণীয় পোশাক ও অলঙ্কারাদি পরে বাইরে বের হতে বারণ করা হয়েছে এবং জনসম্মুখে পোশাক ও আচরণে এমন কিছু প্রদর্শন কতে মানা করা হয়েছে যাতে তাদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে।

স্ত্রীলোকেরা পরিবারের মুহাররামা পুরুষ, চাকর ও দাসদের সাথেই কেবল খোলামেলা কথাবার্তা বলতে পারবে।

সূরা আযহাবের ৫৩ নং আয়াতে বিশ্বাসীগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে রসূল (স)-এঁর স্ত্রীদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের এবং তাঁদের নিকট কিছু চাইতে হলে তা

পর্দার বাহির থেকে চাইতে। ৫৯ নং আয়াতে যখন কোন কারণে কোন মুসলিম মহিলাকে ঘরের বাইরে যেতে হয় তখন তাকে তার পুরো দেহ একটি চাঁদর দিয়ে ঢেকে নিতে বলা হয়েছে, যাতে করে তাদেরকে ধার্মিক মহিলা হিসেবে চেনা যায় এবং যাতে তারা উত্যক্ত না হয়। কোরআন মহানবী (স)-এঁর স্ত্রীদেরকে এবং প্রয়োগিকভাবে সকল মুসলিম মহিলাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যখন কোন জরুরী প্রয়োজনে কোন গায়ের মুহাররাম পুরুষের সাথে সাক্ষাত করতে হয় তখন যেন সে তার সাথে এমন আবেগময় ভঙ্গি ব্যাবহার না করে যাতে লোকটির মনে প্রেমাভাব উৎপন্ন হতে পারে। বরং কথাবার্তা যেন সাদামাটা ও প্রথাগত হয়। হাদিসে মুসলিম নারীদেরকে স্বামী এবং বিবাহ নিষিদ্ধ নিকটাত্মীয়দের ছাড়া অন্য কারো সাথে (অর্থাৎ মুহাররাম কোন পুরুষের পরিচালনা ব্যতিরেকে) একাকী দূর যাত্রায় বের হতে নিষেধ করা হয়েছে।

যেখানে অধিকাংশ সহীহ হাদিসে মুসলিম নারীদেরকে মসজিদে নামাজের জামায়াতে একত্রিত হতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং গৃহের নিভৃত কোণে নামাজ আদায় করাকেই খোদার কাছে অধিক পছন্দনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে; সেখানে একজন মুসলিম মহিলার প্রাইভেট সেক্রেটারী, ব্যাংক ক্লার্ক, বিমান বালা, হোটেল পরিচারিকা, বিজ্ঞাপন মডেল, গায়িকা, ড্যান্সার এবং সিনেমা, টেলিভিশন ও রেডিওতে অভিনেত্রীর ভূমিকায় আসাকে কিভাবে বরদাস্ত করা যেতে পারে ?

সুরা আন-নুরের ১-২৪ নং আয়াতে যারা বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক রাখে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি প্রদানের ভয় দেখানো হয়েছে। ইসলামে এ ব্যাপারে কোন দ্বৈত মাপকাঠির ব্যবস্থা নেই। যারা অবৈধ যৌন সম্পর্ক রাখে সে সকল নারী ও পুরুষের শাস্তির মধ্যে কোরআন ও হাদীসে কোন পার্থক্য করা হয়নি। উভয়ের জন্যই একই রূপ কঠিন শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন ও হাদিসের এই প্রমাণ ছাড়া পর্দার সপক্ষে ইসলামের অধিক আর কি প্রমাণ দরকার হতে পারে ? মুসলিম মহিলাদের চলাফেরার ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র নারীদের প্রতিরক্ষা এবং পুরুষদেরকে তাদের প্রতি অশুভ পদক্ষেপ থেকে সংযত রাখার উদ্দেশ্যেই আরোপিত হয়েছে। পৃথিবীতে ইসলামই হলো একমাত্র ধর্ম যা শুধু অনৈতিকতাকে মন্দ বলেই ক্ষান্ত হয় না বরং অনৈতিকতাকে উদ্দীপ্ত করে এমন যে কোন সামাজিক কর্ম থেকে বিশ্ববাসীদেরকে ফিরে থাকতে আদেশ দেয়।

নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রবক্তা হচ্ছেন সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও এঙ্গেলস। ১৮৪৮ সনে প্রকাশিত তাদের কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো বইয়ে তারা লিখেন, "গৃহ ও পরিবার একটি অভিশাপ ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, এটি নারীদেরকে চিরস্থায়ীভাবে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে।" তারা বলেন, " নারীদেরকে পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্তকরে দিতে হবে এবং কল-কারখানায় সার্বক্ষনিক

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদেরকে পুরোপুরি অর্থনৈতিক স্বয়ংম্ভরতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে।" তাদের পরবর্তী নারীবাদী প্রবক্তারা সহশিক্ষা, ঘরের বাইরের একই কর্মস্থলে সহকর্মাবস্থান, সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে নারী-পুরুষের একত্র মিলন, অর্ধনগ্ন পোশাকে বিবাহপূর্ব প্রেম-অভিসার এবং যূথ সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে মদ্যপান, নেশাপান ও নৃত্যগানের মাধ্যমে নারী-পুরুষের অবাধ যৌনাচারের সুযোগদানের জন্য জিদ ধরেন। এক্ষেত্রে তারা সরকারি ব্যবস্থাপনায় জন্মনিরোধক সামগ্রী, বন্ধাকরণ ব্যবস্থা, অবাঞ্ছিত গর্ভের বিমোচন, অবৈধ সন্তানদের লালন পালনের জন্য রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত নার্সারী ও বোর্ডিং- এর ব্যবস্থা রাখার দাবী করেন। এটাই হচ্ছে আধুনিক "নারী অধিকার" তত্ত্বের মূলগত ধারণা।

লাহোরের গুলবার্গ গার্হ্যস্ত অর্থনীতি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে তেহরান ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যাঞ্চেলর শ্রোতাদের এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, "আধুনিক সভ্যতার যেটুকি খারাবী যোগ হয়েছে তা অতি উদ্বিগ্ন রক্ষণধর্মী প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার চেয়ে অনেক কম।" কিন্তু এই ভীতির কারণগুলো কি কারো জানা আছে? দেখুন না, নারী স্বাধীনতার কি ফল পশ্চিমারা ভোগ করছে!

আমেরিকান এক ঐতিহাসিক ও কলামিস্ট ম্যাক্সলার্নার বলেন, "আমরা একটি বেবিলিনীয় সমাজে বাস করছি। ইন্দ্রিয় সেবার প্রতি গুরোত্বারোপ ও যৌন স্বাধীনতার ফলে সমাজের সকল পুরাতন নীতি-নৈতিকতার বন্ধন ভেঙ্গে গেছে।" কিছুদিন আগেও কি জনসম্মুখে প্রকাশ করা যাবে কিংবা যাবে না তা নির্ধারণ করতো চার্চ, রাষ্ট্র, পরিবার ও সম্প্রদায়। কিন্তু অধুনা এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলো জনসাধারণের দাবির কাছে পরাজিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর এখন দায়িত্ব দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র শোনা ও দেখা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র দর্শকরা প্রতিদিন আর্ট গ্যালারী ও নাট্য গৃহসমূহে একত্রিত হচ্ছে উলঙ্গপ্রায় সুইডিশ নায়িকার 'আমি এক নারী' সিরিজের পর্ণ নাচ গান দেখে যৌন উত্তেজনা প্রবল করার জন্য। ইটালীয় সিনেমা পরিচালক ম্যাকিল্যানজেলো এন্টোনিওনি তার 'ভেঙ্গে দাও' ছায়াচিত্রে নগ্নতা বিরোধী সকল ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার মাথা খেয়েছেন। ফরাসী কৌতুক প্রিয় নায়িকা জেনফন্ডা সীমাহীন প্রলোভনধর্মী ছায়াছবি বারবারেলায় মুক্ত প্রেমাভিসারের গুণ কীর্তন করতে করতে একটি নগ্নতার দৃশ্য থেকে পরবর্তী অধিকতর আর একটি নগ্নতার দৃশ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন। কমপক্ষে দু'ঘণ্টা স্থায়ী 'জেসনের প্রতিকৃতি' নামক ছায়াচিত্রে একজন নিগ্রো বেশ্যা পুরুষের বিকৃত আত্মার ভ্রমণ কাহিনী এখন আমেরিকার প্রায় সকল পেক্ষাগৃহগুলোতেই খোলাখুলিভাবে দেখানো হয়ে থাকে, যা মানব জীবনের দিকগুলোকে সংকুচিত করেছে। খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ববিদ ফাদার ওল্টার জে. ওং বলেন, "আমরা শীঘ্রই জানা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিক মাত্রায় স্বাধীন জীবন যাপনের সুযোগ পাচ্ছি.....।" (রিডার্স

ডাইজেস্টের ১৯৬৮ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত "সমাজ যেদিকে যাচ্ছে আমাদের সব কিছু সেদিকে যাচ্ছে" নামক নিবন্ধ থেকে)।

আসুন পাশ্চাত্যের এই সামাজিক অবক্ষয়ের কি প্রভাব মুসলিম দেশগুলোর ওপর পড়েছে তা দেখা যাক। নারী স্বাধীনতা ও নৈতিক অধঃপতনের একটি প্রধান ও কার্যকর মাধ্যম হলো সিনেমা। "লাহোরের হিরামন্ডি জেলার প্রতিটি মেয়েরই আকাংখা হচ্ছে অভিনেত্রী হওয়া। তারা সকলেই চাচ্ছে চিত্রনায়িকা হতে। এই ইচ্ছার বাস্তবায়নের জন্য তারা যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী আছে। এদের একটি বিরাট সংখ্যক মেয়ে তাদের নায়িকা হওয়ার আকাংখা পূরণের শর্তে তাথাকথিত সিনেমা পরিচালক ও প্রযোজকদের খুশী করার জন্য যে কোন জায়গায় উপস্থিত হতে রাজী রয়েছে। সিনেমা শিল্পের দ্বারা খুব সহজে ও সাধারণভাবে বিভ্রান্ত মেয়েলোক এরাই। এদের অধিকাংশই টুকিটাকি কিছু অভিনয়ের সুযোগ পেলেই খুশী। অতিরিক্ত বেশ কিছু মেয়ে এভাবেই সিনেমার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। এদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন অবশ্যি প্রতিষ্ঠাও পায়। শহরের অনেক হোটেলেই "শুভ সময়" এর কাজে ব্যবহৃত হয়। কতিপয় হোটেল পরিচালক থাকে কোটনার ভূমিকায়। অধিকাংশ রেস্তোরাঁ ব্যবহৃত হয় খদ্দেরের সাথে নষ্টা মেয়েদের সাক্ষাতের স্থান হিসেবে। এ সকল মেয়ে লোকদেরকে নগরীর বাস স্ট্যান্ডগুলোতেও দেখা যায়। শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলোও খদ্দের ধরার জন্য খুবই পরিচিত স্থান। প্রেক্ষাগৃহগুলো যে সিনেমা দেখা ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না তাও নয়। এ সকল ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা খুবই শিথিল।" (১৯৬৮ সালের ২৯ ও ৩০শে মার্চ তারিখে 'দি পাকিস্তান টাইমস'-এ প্রকাশিত 'লাহোরে বেশ্যাবৃত্তি' নামক প্রতিবেদন থেকে)।

ক্রিস্টাইন কিলার অথবা মেরিলিন মনরোর মত মহিলা সেনাবাহিনী গঠন করা কি আমাদের জাতীয় উন্নয়নের অংশ হতে পারে?

নারী স্বাধীনতার পক্ষে পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং সিনেমার প্ররোচনা স্ত্রী ও সন্তানের মা হিসেবে নারীর ভূমিকাকে তাছিল্য ও খাটো করেছে। সন্তানের লালন-পালনের জন্য নারীদের গৃহে অবস্থানকে এই প্রচারণা জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অর্ধেক জনশক্তির অনুপস্থিতির ফলে অমার্জনীয় ক্ষতির কারণ বলে বর্ণনা করেছে।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে মুসলিম দেশসমূহে সহশিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে ছেলে মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ও যৌন অপরাধ প্রবণতা এমনভাবে বেড়েছে যে, তা অজস্র যুবক-যুবতীকে ধ্বংসের মুখোমুখি করে দিয়েছে এবং বিস্তর ঘটিয়েছে অসংখ্য পাপ কর্মের। সহশিক্ষা এই ভ্রমাত্মক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে জন্মগত কোন পার্থক্য নেই, সুতারাং উভয়কেই একই কর্মক্ষেত্রে অভিন্ন কাজের জন্য নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। ফলতঃ যে সকল মেয়ে সহ-শিক্ষা গ্রহণ করে তারা

খুবই খারাপভাবে নিজেদেরকে বিবাহ ও মাতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করে। এরপরও নারী স্বাধীনতাবাদীরা বলে থাকেন মেয়েদের প্রাথমিক দায়িত্ব স্বামীর গৃহেই। এ কথার অন্য অর্থ দাঁড়ায়, আধুনিক নারীদেরকে দ্বৈত দায়িত্ব পালন করতে হবে। নিজের জীবিকার জন্য সারাক্ষণ ঘরের বাইরে কাজ করার পরও ঘরে ফিরে তাকে সন্তানের লালন-পালন, ঘরদোর সাজানো ও স্বামীর প্রয়োজন পূরণের মত অসম্ভব প্রায় সব বাধ্যবাধকতা পালন করতে হবে। এটাও কি ন্যায় বিচার?

মুসলিম দেশসমূহে অধুনা পাশ্চাত্যের আইনের অনুরূপ যে পারিবারিক আইন পাশ করা হয়েছে, সে আইন কি বাস্তবিকভাবে আমাদের নারী সমাজের কোন উন্নয়ন ঘটিয়েছে? এই আইন সতর্কভাবে বিবাহের জন্য একটি বয়সসীমা নির্দিষ্ট করে দেয় বটে, কিন্তু এই বয়স সীমার নিচে (বিবাহ নিষিদ্ধ বয়সে) ছেলে-মেয়েদের অবৈধ যৌন কর্মের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করার বিষয়টি বেমালুম ভুলে যায়।

অধিকাংশ মুসলিম দেশে আধুনিকতাবাদীরা কোরআন ও সুন্নাহর আইন লঙ্ঘন, বহুবিবাহ প্রথাকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, এমনকি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। তারা কখনই এই মানসিক অবস্থাটা বুঝতে চাচ্ছেন না যে, একজন স্ত্রীর পক্ষে তার স্বামীর অন্য একজন স্ত্রী যিনি তার নিরাপত্তাধীনে রয়েছেন এবং তার সন্তানেরা পিতার ভালোবাসা ও যত্ন পাচ্ছেন তার সাথে স্বামীর ভালোবাসাকে ভাগাভাগি করে নেয়া ভালো, না দেশীয় আইনে বর্তমান স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে এবং তার সন্তানদের সহ তাকে তাড়িয়ে না দিয়ে অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণে বাধা আছে বলে গোপনে কোণ মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক রেখে চলছে তা দেখা ভালো?

এটা কি সেই মহিলার জন্য কল্যাণকর নয়, যে তার স্বামীর সাথে ভালোভাবে থাকতে পারছে না, তাকে তার স্বামীর ব্যক্তিগতভাবে তালাক দিয়ে দিবেন এবং এই দম্পতি শান্তিপূর্ণভাবে পৃথক হয়ে গিয়ে আবার নতুন করে পছন্দমত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন? না, সেইটা ভালো যে, তাদের বিষয়টি কোর্টে যাবে এবং স্বামী এই বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কোর্ট নির্ধারিত ডিভোর্সের "প্রয়োজনীয় শর্ত" পুরণার্থে বাধ্য হয়ে স্ত্রীর ওপর অনৈতিক আচরণ ও পাগলামির মিথ্যা দোষারোপ করবে, যা মহিলাটির জন্য সামাজিক কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াবে এবং বেচারিনীর সকল সুনাম সুখ্যাতি জীবনের তরে ধূলিস্যাত করে দেবে?

প্রকিতপক্ষে নারী স্বাধীনতাবাদের প্রবক্তারা নারীর ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার প্রতি আগ্রহশীল নয়। লাহোরে 'নিখিল পাকিস্তান মহিলা পরিষদ' আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে পরিষদের এক সক্রিয় সমর্থক জনাবা সাতনাম মাহমুদ তার বক্তব্যে সরলতার সাথে এ কথা স্বীকার করেন যে, যদিও পাশ্চাত্যের মহিলারা বস্তুগত প্রাচুর্য এবং সামাজিক পূর্ণ স্বাধীনতা ও সম-অধিকার ভোগ করছে, তথাপি তারা কাঙ্ক্ষিত

সুখে সুখী নয়। তিনি বলেন, যদি আত্মীক সুখই লক্ষ্য হয় তবে তার সমাধান তথাকথিত নারী স্বাধীনতার মধ্যে পাওয়া যাবে না। সুবিধাবাদী সমাজকর্মী এবং উক্ত মহিলা পরিষদের অন্যতম সদস্যা বেগম কাইসেরা আনোয়ার আলী তার বক্তব্যে যে সকল উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা নিজ ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের বিষয়ে এমনভাবে নৈরাশ্য প্রকাশ করেন যে, তাদের সংগঠন মেয়েদের এই উন্নাসিকতার যে সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক তা যেন তিনি জানেনই না।

"সকল মুসলিম দেশেই নারী স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে"- এ প্রচারণার আসল উদ্দেশ্য কি? এটা আসলে একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্র যা আমাদের সংসার, পরিবার এবং এমনকি গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিতে চায়। 'নারী অধিকার', 'নারী স্বাধীনতা' ও 'নারী উন্নয়ন' প্রভৃতি সস্তা শ্লোগান শুধুমাত্র মূল উদ্দেশ্যকে কুহেলিকার আবরণে ঢেকে রাখার জন্যেই।

মুসলিম বিশ্বে নারী মুক্তি আন্দোলন সেই চরম পরিণতিই ডেকে আনবে যা বিশ্বের অন্যান্য স্থানে এখন ঘটছে। যৌন বিষয়ে বিশ্বব্যাপী আজকের মানব সম্প্রদায় যে হারে ন্যাকারজনক আচরণে লিপ্ত হয়েছে তা বন্য পশুদের বিবেককেও হার মানায়। এই আচরণের অনিবার্জ পরিণতিতে সংসার ও পরিবার পদ্ধতিসহ সামাজিক সকল নৈতিকতার বন্ধন সম্পুর্নরূপে ভেঙ্গে পরবে এবং ব্যাপকভাবে কিশোর অপরাধ, দুর্নীতি, নির্যাতন, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আইনের কার্যকরীহীনতা দেখা দিবে। অতীতের সকল ইতিহাসই এর যথার্থ সাক্ষী যে, যখনই কোন সমাজে পাপ ও অনৈতিকতার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে সে সমাজ আর বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি।

উপসংহার

ইসলামে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং তাদের মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। খাদিজাহ (রা.) এর মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে পণ্ডিত ও নেতা পর্যন্ত তারা ইতিহাস জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামে নারীদের সম্মান ও সম্মানের সাথে আচরণ করা হয়, শালীনতা ও সুরক্ষার নির্দেশিকা সহ। হাদিসগুলি মহিলাদের সাথে সদয় আচরণ করার, তাদের স্বায়ত্তশাসনকে সম্মান করার এবং তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দেয়।

ইসলামী সমাজের মধ্যে বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি সর্বদা নারীর অধিকার সম্পর্কিত সত্য ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। অনলাইন ফিকহ পাঠের মতো নির্ভরযোগ্য উৎসের মাধ্যমে ইসলামে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে শেখার মাধ্যমে , আমরা সমাজের সকল সদস্যের জন্য বোঝাপড়া, ক্ষমতায়ন এবং অন্তর্ভুক্তি প্রচার করতে পারি।আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহসহ সবাইকে নারীর প্রতি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদায় ইসলামের বিধান মেনে চলার তাওফিক দান করুন। বিশ্বজুড়ে সবাইকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামের বিভিন্ন ইতিবাচক দিকগুলো বাস্তবায়নের তাওফিক দান করুন। আমিন।